R.K.M. VIVEKANANDA VIDYABHAVAN
14.3.19
LIBRARY

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

মাঘ, ১৪২৫
ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

প্রকাশিকা ঃ
প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
৩৩, নয়াপট্টি রোড, দমদম
কলকাতা-৭০০ ০৫৫

সম্পাদনা — ডঃ রুমেলা বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ রাখি ঘোষ
ডঃ সুনেত্রা মিত্র
ডঃ দেবরূপা দাস
ডঃ সাবেরী রক্ষিত
অনুরাধা সাধুখাঁ
ডঃ রোহিনী ধর্মপাল

মুদ্রক ঃ
পেলিকান প্রেস
৮৫, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০১২

প্রাক-কথন

প্রকাশিত হলো বিদ্যাভবন পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যা। বিগতপ্রায় ষাট দশক ধরে যুগাচার্য রামকৃষ্ণদেব সারদা-মা ও স্বামীজীর নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠান স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী।

স্বামীজী বলতেন 'Man making is my mission' বাস্তবিক সেই সুসংস্কৃত, আত্মনির্ভরশীল, প্রগতিশীল মানুষ গড়ার শিক্ষাই বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের মূলকথা। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে অস্থিরতা এবং নানা সমস্যা ব্যক্তি ও শিক্ষাজীবনে দেখা দিয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে নেওয়ার জন্যই চাই শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামীজীর শিক্ষা ও আদর্শ। তাঁদের মহামূল্যবান কথা ও বাণী আজ আমরা আধুনিকযুগে পা রেখে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি। তাঁদের সেই বিশ্ববাণী ভারতের ছেলেমেয়েদের কাছে প্রতিবাদী কুঠার হয়ে উঠুক এটাই আমাদের লক্ষ্য।

বিশ্বায়নের মূলমন্ত্র যে দেশের ও দশের প্রগতি— বিদ্যাভবনও সেই ভাবধারাকে আত্মস্থ করে নিজ কর্মধারার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। যুগের সঙ্গে তাল রেখে নব নব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিদ্যাভবন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২০১৮র শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে শুরু হয়েছে ভূগোল ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাম্মানিক পাঠক্রম।

শুধু জ্ঞানের চর্চা বা বিদ্যাভ্যাসই নয়, তার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও বিদ্যাভবনের ছাত্রীরা তাদের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মৌলিক চিন্তার পথ প্রশস্ত করার জন্যই এই পত্রিকার প্রকাশ। সৃষ্টিশীল প্রতিভার নিরিখে উচ্চ পর্যায়ের না হলেও তাদের আন্তরিক উৎসাহ ও প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করছে রচনাগুলি। পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করতে অধ্যাপিকারাও তাদের রচনা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

সবশেষে পত্রিকার পরিচালন গোষ্ঠী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আমাদের কথা এখানেই শেষ করছি।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক
১।	Sister Nivedita–a dedicated Soul–	Pravrajika Bhaswaraprana
২।	Mary Astell and the Birth of a Modern feminist consciousness	Dr. Rakhi Ghosh
৩।	অচেনা বন্ধু লালী	স্বস্তিকা যশ
৪।	প্লাস্টিক দূষণ ও তার প্রতিকার	অমৃতা প্রামাণিক
৫।	স্মৃতির সরণী বেয়ে	প্রাক্তনী সংসদ (জয়া চক্রবর্তী, ইভা মণ্ডল, সুমনা চৌধুরী)
৬।	বিদ্যাভবনের দুটি স্মরণীয় দিন	রিনীতা মুখার্জী
৭।	এক টুকরো স্মৃতি কথা	মৌসুমী ঘোষ
৮।	পরিচয়	সুমনা সিংহ
৯।	Jaipur–'a splendour in pink'	Rhitobrita Chakraborty
১০।	The Rise of Feminism	Akanksha Krishnatre
১১।	Heartbreaks	Sulagna Sarkar
১২।	অনন্তবর্মা	সাবেরী রক্ষিত
১৩।	ভগিনী নিবেদিতার ভারতসেবা, নারীবাদ ও নারী কল্যাণ	সোমা দাস
১৪।	অন্ধকার জগতে আলোর দিশারী	মৌমিতা সাহা
১৫।	মোবাইল ফোনের রহস্য	ডঃ বিদিশা চ্যাটার্জী
১৬।	পঞ্চব্রত	অনুরাধা সাধুখাঁ
১৭।	মুক্তি	নম্রতা মণ্ডল
১৮।	এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান	নিবেদিতা মণ্ডল
১৯।	এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক	সুপ্রিয়া মণ্ডল
২০।	বিচ্ছেদ	অনুরিমা সাহা
২১।	অরণ্যানী	সংঘমিত্রা মুখার্জী
২২।	অণু-কবিতা	ডঃ রোহিনী ধর্মপাল
২৩।	ডাকে কি এসে যায় ?	নবনীতা ভট্টাচার্য
২৪।	করুণাসিন্ধু রামকৃষ্ণ	দোলন সরদার

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক
২৫।	Today's Draupadi	Abhisikta Ghosh
২৬।	কলকাতায় শীতের সকাল	সুস্মিতা ঘোষ
২৭।	বৃষ্টি	অস্মীতা মণ্ডল
২৮।	হাতের নাগালে সাগরপাড়, মনের শান্তি মন্দারমণিতে	পৌলমী লাহিড়ী
২৯।	পরিবেশের প্রতি মানুষের অত্যাচার	শ্রেয়শী কর্মকার
৩০।	রাশিফল	বীণা বালী
৩১।	Woman as Ghost as God	Akanksha Krishnatre
৩২।	Symphonies of the wind	Rishika Ghosh
৩৩।	Crack of Dawn	Diptanwita Biswas
৩৪।	পাখি	সম্পা মণ্ডল
৩৫।	সাত ভাই চম্পা	রিন্তা ঘোষ
৩৬।	নীরবতা	রিয়া রায়
৩৭।	Truth is nowhere	Indrani Mukhopadhyay
৩৮।	সেমেস্টার	সুচেতনা হাউলি
৩৯।	মনুষ্যত্ব	বীণা বালী
৪০।	মা	সুস্মিতা ঘোষ
৪১।	আমি হতে চাই	রিয়া বাহাদুর
৪২।	নবদিগন্ত	মাধবী মিস্ত্রী
৪৩।	গোলাপ	সুকৃতি পাত্র
৪৪।	ফেলে আসা স্মৃতি	সোনালী নন্দী
৪৫।	বসন্তের আগমন	সুস্মিতা ঘোষ
৪৬।	একটি মেয়ের আত্মকথা	প্রীতি দে
৪৭।	কমনরুম	অস্মীতা মন্ডল
৪৮।	রক্ষনশীলতা ও প্রগতীবাদের সমন্বয় — শ্রীমা	ঋতু পোল্লে
৪৯।	মানবজীবনের গৌরব ও অর্জনের উপায়	ঋতু পোল্লে
৫০।	আমার জন্মভূমি	ঋতু পোল্লে

Sister Nivedita– a dedicated Soul

Pravrajika Bhaswaraprana

Each new incarnation has a new historic mission to fulfil. And unmistakably the Godman finds out the chosen few who are to fulfil that mission. They are consecrated, so to say, to the great cause of emancipation of the human race. The history of the world is the living witness to it. The Ramakrishna-Vivekananda ideological movement may be better appreciated if viewed from this angle. Sri Ramakrishna's divine consort, Sri Sarada Devi, his direct disciples, a few followers from among householders—all were united together to pursue the same supreme goal, visualising the spiritual uplift of the masses, which did include within its purview the parallel progress in every field of life—social, political and economic. Swami Vivekananda's mission was to 'revitalise Hinduism' through the insurgence of Vedantic ideal of oneness of soul which was to be realised in and through all sorts of activities of life. Swami Vivekananda declared that proper education would help one to know one's infinite potency and thereby would make one free, strong and guileless.

Miss Margaret Noble, a really noble-hearted Irish lady, was also chosen by God to fulfil the same purpose. Through her, we were to realise the ideal of 'dynamic orthodoxy' of Hindu religion, ideal of nationalism vitalised by austerity and spirituality—which were really the crying need of that age. Her great Master, Swami Vivekananda was the torchbearer of the new era in India. Miss Noble, widely known as Sister Nivedita, appeared to herald the Vivekananda Age in the national consciousness of India and brought about a silent revolution in the thought-world of the intellectuals of the country. At the time when India was at the cross-roads—when the glamour of Western material civilisation was about to overwhelm Oriental spiritual ideal, when the educated Indians had lost respect for their own heritage, it was Nivedita, paradoxically enough, a Western lady who appeared in the arena, like an evangelist, to preach the inner hidden message of beauty, strength and bliss

of Hindu religion and philosophy. It was really a magnificent revelation to the contemporary Indians.

Margaret repeatedly heard her Master say that truth must be realised. The freedom of the human self is in the realisation of the truth which must be manifested at every moment of life. Miss Noble, who remained so long unhappy with the stereotyped Christian dogma and time-bound church services, found these as 'living water to a person perishing of thirst.' She said afterwards in her Bombay lecture of 1902 : "After the age of eighteen, I began to harbour doubts as to the truth of the Christian doctrine. For seven years, I was in the wavering state of mind, very unhappy. Yet very, very eager to seek the truth."

To her rare, keen insight, Hindu religion revealed its infinite inner glory, its immense strength and charm. The transformation of Margaret to Nivedita, the 'dedicated', had actually taken place at the very time when she felt herself ready to accept the all-embracing, all ingulfing one absolute truth of *Advaita Vedanta Dharma,* of which other worldly truths were but partial expressions. She realised that the Hindu concept of religion was not a mere philosophical doctrine, but it was a dynamic religion, where universal practical outlook, great sanctifying power, would lift up the entire human life with all its passions, and emotions, with all its activities. With this firm, steady conviction she wrote : "Hindu faith rests from first to last on a basis of experience, of realisation, of personal appropriation. ... The super-social life is seen in its true relation to society. The goal is preached as attainable, not only by the *sadhu* in the forest, but also by the butcher in the town and the wife in the home." Reiterating Swami Vivekananda, she proclaimed : "There is no distinction between sacred and secular," "to labour is to pray."

Awakened to the call of the great truth, Nivedita embraced wholeheartedly the ideal of dedication, that would create a new history for the posterity. It was really the sublimity and broadness of *Advaita* philosophy which compelled her to love and to respect India from the innermost core of her heart. This intense reverence and love for India was her Master's legacy which was infused in her mind. For this reason, she could survey rightly the source of sorrows and sufferings of Indian people, could measure the

dimensions of glory on the one hand and of degeneration on the other. She tried her best to lift up the nation that had once flourished, into a resurgent nationhood. For the regeneration of Hindu culture, art, architecture, literature, with its original social set up, she actually proved herself a martyr. She was firm in her conviction that India, the land of the sages, of purity, spirituality and renunciation, was the cradle of human civilisation. In her composition, *The Web of Indian Life,* we find an extensive historical research that highlighted significant aspects of Indian History and heritage.

With her penetrating intelligence, Nivedita discovered in Hindu religion, the happy synthesis of God and the world. It was beyond her imagination that love of God could be combined with the ideal of social welfare, with all mundane needs. She actually aspired so long after this grand truth. To her, Hindu religion appeared supreme for this gospel of divinity of individual, nay, the divinity of everything. With this attitude of perfect reverence and love, she used to relate to her students, to her friends—Indian or Western, the noble epic characters of Sita, Savitri, the chivalry of Rajput women of Indian History. She never felt tired of depicting the glorious picture of the great Indian race. Her stay with the Holy Mother Sri Sarada Devi provided her with a glimpse of an orthodox Hindu life. She was quite able to penetrate into its charm, serenity and nobility without taking its drossy outward show into account. Rabindranath Tagore very aptly remarked about Nivedita : "The vision that enables one to see the greatness of humanity in a humble individual, is a very uncommon gift. It was, because this vision was natural to her, that she did not lose her reverence for India, despite its outer blemishes."

Sister Nivedita wrote about Sri Ramakrishna : "He is a witness to the world that old Indian wisdom was not in vain. It is, of course, true that in no other country could He have occurred. But it is not true that He expresses the mind of India alone or even chiefly. For in Him meet the feeling and thought of all mankind, and He Ramakrishna, the devotee of Kali, represents humanity." This assessment shows how Hinduism revealed itself to her. According to Nivedita, *Advaita* concept of religion had enriched the whole of human civilisation for eternity. The image of Kali appeared to her as the

most bold, most gracious of all the symbols the Hindus had ever imagined. In her lecture .on Kali', she elicited a new meaning from Kali worship. She said : "It was so easy to say that God was love and to think our own private happiness proves it, God is love. But when do we learn that ? How do we know it ? Is it not in moments of anguish in our own lives that the great reality is borne in upon us as all love, all beauty, all bliss ? This was the paradox, so boldly stated in the Kali image."

Nivedita maintained that there must be a re-reading of orthodoxy, a rediscovery of essentials. This, she termed 'dynamic orthodoxy'. Unlike a social reformer, she looked upon the native customs, habits, life style, not only to be restored in their pure form, but to be executed also with more vigour and faith. This is the message of her *Aggressive Hinduism.* She insisted that Hinduism should be shorn of all sluggish, passive formalities. It should be made aggressive—not in the sense of tyrannical and oppressive but in the sense of active, energetic and dedicated to the service of mankind. She wrote : "We see Hinduism no longer as the preserver of the Hindu customs, but as the creator of Hindu character." What we needed most, was in her words, "instead of passivity, activity ; instead of the standard of weakness, the standard of strength." Reiterating the ideal of the *Gita,* she proclaimed : "Work is as necessary to the growth of soul as is the Vedanta *Dharma,* perhaps more so. Work is the *puja* which a man offers to that great power manifested as nature; ... *Karma* is no longer a destiny, but an opportunity." Every Hindu should perform the respective duties of life, she said, with all his energy, faith and in the spirit of renunciation. To her, renunciation and emancipation run *pari passu.*

In *Aggressive Hinduism* Nivedita wrote : "Our task is to translate ancient knowledge into modern equivalents. We have to clothe the old strength in a new form. The new form without that old strength is nothing but a mockery, almost equally foolish is the savage anachronism of an old time power without fit expression." Hinduism with all its intricate problems of rituals, caste, plight of women, was a thing to her, to be adored earnestly. Hindu religion seemed to disclose its inner, intrinsic charm and beauty to its foreign yet beloved, Sister Nivedita. According to her, our 'caste' concept ought to stand

translated as honour. She wrote to an English friend : "It is as true of London, as of Benaras that caste law is the last and finest, that controls a man." Indian women, with their pristine purity, attracted her most. She thought that Indian women, untouched by Western influence, did possess a genuineness of their own, which we, the moderns often fail to recognise.

Marital relation was considered by her as purely religious, sacred and a sure path to realise spiritual bliss. To her, the ideal of motherhood in an Indian woman stood unparalleled. Hinduism, Nivedita concluded, with all these splendid features, should not be regarded as a stagnant, obsolete theory. On the contrary, it was always made anew as the experiences of life became richer and wider. New ideas and ideals, evolved on the way of life, should be synthesized with the old ones. Hinduism has made a provision for this synthetic unity which is to be achieved, not by passive contemplation, but by active participation in actual life and work. Nivedita wrote : *"Advaita* can be expressed in mechanics, in engineering, in arts, in letters as well as in philosophy and meditation. But it can never be expressed in half measures. The true *Advaitin* is the master of the world. ... In the little he sees the great."

* * *

My life is given to India. In it I shall Live and Die.
– Sister Nivedita

MARY ASTELL AND THE BIRTH OF A MODERN FEMINIST CONSCIOUSNESS

Dr. Rakhi Ghosh

Associate Professor, Department of English

Mary Astell (1666-1731) can undoubtedly be termed as the first woman writer in England who wrote on the subject of gender equality. Little is known about her early life. Her parents Peter Astell and Mary Errington belonged to prominent, commercial families. It is widely circulated that she knew the classical languages (Smith, *Astell* 6-7). She was taught in her childhood by her clergyman uncle Ralph Astell, who was a Cambridge neo-Platonist. She was well-read, was acquainted with the political debates of the day and took a keen interest in political philosophy. Due to her slim dowry, her marriage prospects dwindled. After her mother's death, she left Newcastle for London and ultimately settled at Chelsea. The former archbishop of Canterbury, William Sancroft, provided her financial aid. Her residence there enabled her to come in contact with her courtly neighbours as she soon earned an intellectual reputation. Her friends included Elizabeth Elstob, the Anglo-Saxon scholar, Lady Elizabeth Hastings who also intended to set up a charity school for women, the learned Bishop Francis Atterbury and above all, Lady Mary Wortley Montagu, a member of the courtly circle of George I.

Mary Astell followed a "...tradition of proto-feminist writing that focuses on education as the root and branch of female inequality and customary right as the conventional strategy to entrench it" (Springborg, *Astell* 17). Her predecessors include Christine de Pizan and Marie de Gournay. Patricia Springborg also establishes a link between Mary Astell and the Restoration satires on women and marriage (Springborg, *Astell* 19). She was an avid political writer of her time though she published her satirical view of the ascension of William and Mary of Orange anonymously. She recognised the fact that as a woman, she was excluded

from participating in political matters. Matters worsened for women in the years following the Glorious Revolution when women tried to assert their individuality and their rights, it appeared as a form of rebellion against the revolutionary settlement that revolved around the accession of William and Mary on the English throne. Mary Astell was piqued when William and Mary were hailed as harbingers of constitutional monarchy in England. Instead, like other Tories of her time, she looked upon the accession as the substitution of the unstable tyranny of a group of petty and selfish opportunists for a stable and honoured ruler (Ruth Perry, "Mary Astell and the Feminist Critique of Possessive Individualism" 445). She recognised the fact that the new government professing revolutionary intentions was ready to hoodwink women and allow them to believe that they could assume political power. That is why she came to distrust republicanism and asserted that monarchy was the best for maintaining ideal conditions. Thus hers is a curious mixture of conservative opinions and modern feminist consciousness.

The mid-seventeenth century saw an unprecedented rise of feminist protest among which the most popular thoughts came from the pen of Mary Astell. Her two notable feminist tracts *A Serious Proposal* (1694, 1697) and *Some Reflections upon Marriage* (1700) speak in favour of female education and female empowerment in marriage. In the 'Preface' to *Some Reflections upon Marriage* she makes the famous comment: "If *all men are born free,* how is it that all women are born slaves..." (Springborg, *Astell, Political Writings* 18).

In *A Serious Proposal* Astell defends women's needs for spiritual and intellectual nourishment. The same idea is treated in *Some Reflections upon Marriage* as well. Her feminist polemic, *A Serious Proposal,* was written in two parts, the first of which appeared in 1694 and the second in 1697. Some memorable lines from the tract highlight how she critiqued the condition of women in her time: "Wou'd have you all be Wits, or what is better, Wise. Raise you above the Vulgar by something more truly illustrious, than a sounding Title or a great Estate. Wou'd excite in you a

generous Emulation to excel in the best things, and not in such Trifles as every mean person who has but Money enough may purchase as well as you. Not suffer you to take up with the low thought of distinguishing your selves by any thing that is not truly valuable, and procure you such Ornaments as all the Treasures of the Indies are not able to purchase. Wou'd help you to surpass the Men as much in Vertue and Ingenuity, as you do in Beauty, that you may not only be as lovely, but as wise as Angels."

In *Some Reflections* Astell explains why a well-educated wife is necessary for a man to sustain a marriage and make it happy and lasting: "But how can a Man respect his Wife when he has a contemptible Opinion of her and her Sex ? . . . Because she was made to be a Slave to his Will, and has no higher end than to Serve and Obey him !" (Springborg, *Astell, Political Writings* 57). The Puritan view of the meek housewife that prevailed in the eighteenth century favoured women who barely knew the letters but had cultivated the social graces like music, painting, drawing, dancing and needlework. These 'accomplishments' as they were termed, seldom helped women attain economic independence ; they merely added lustre to their amiable personalities. Novelists like Austen sharply reprimanded the intentions that forced these accomplishments on women. In the long run the learned lady became an obsolete concept in England in the late sixteenth and early seventeenth centuries. In the seventeenth century these social graces helped a woman to ensnare a prospective groom rather than enhance her own personality. Even these modest efforts to acquire preliminary education were sometimes neglected. Astell rated accomplishments poorly :

"When a poor Young Lady is taught to value her self on nothing but her Cloaths, and to think she's very fine when well accoutred ; When she hears say, that 'tis Wisdom enough for her to know how to dress her self, that she may become amiable in his eyes., to whom it appertains to be knowing and learned ; who can blame her if she lay out her Industry and Money on such Accomplishments, and sometimes extends it farther than her misinformer desires she should ?"

Astell proposed a religious retirement for women so that they could not be persecuted by male-dominated beliefs and customs. Since education was the natural right of all thinking and reasonable individuals, women should not be deprived of the ideal kind of education. Such education would be provided in her nunnery where women will learn to evaluate marriage from an intelligent perspective:

"Happy Retreat ! which will be the introducing you into such a Paradise as your Mother Eve forfeited, where you shall feast on Pleasures, that do not like those of the World, disappoint your expectations, pall your Appetites, and by the disgust they give you put you on the fruitless search after new Delights, which when obtained are as empty as the former ; but such as will make you truly happy now and prepare you to be perfectly so hereafter (Astell, *A Serious Proposal 186).*"

Astell realised that education would ultimately gear women towards nurturing a rationalist 'consciousness, so that they will be able to locate the traps' that marriage opened for them. Such foresight would enable women to enter the public sphere and pave the way for their own empowerment.

অচেনা বন্ধু-লালী

স্বস্তিকা যশ

ছোটোবেলা থেকেই আমার ফুলের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ফুল দেখতে, বিভিন্ন ধরণের ফুলের নাম জানাই ছিল আমার অন্যতম বিশেষ কাজ। বাবার সহায়তায় আমি অনেক বিদেশী ফুলের সাথেও পরিচিত হই। কিন্তু কেন জানি না, হঠাৎ-ই আমার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করল নাম না জানা একটি ফুল। না সে কোনো বিদেশী ফুল নয়, সেটি রাস্তার ধারে অবহেলিত, আবর্জনাস্বরূপ একটি রাস্তার ফুল। প্রত্যহ সকালবেলা যখন বাবার হাত ধরে স্কুলের দিকে রওনা হতাম ঠিক তখনই অকস্মাৎ আমার নজরে আসে এই ফুলটি। বলাবাহুল্য তার কোনো সুমিষ্ট গন্ধ নেই, আছে কেবল রূপ-টকটকে উজ্জ্বল বেগুনী রংয়ের ফুল।

প্রথমবার যখন ফুলটিকে দেখি তখন আমার তাকে সদ্যোজাত শিশু বলে বোধ হয়েছিল। আর এই শিশুটির প্রাণরক্ষার তাগিদে বাবার হাত ছেড়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তার দিকে। কারণ সরু লিকলিকে ডালের আগায় প্রস্ফুটিত এই ফুলটি তখন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ফেলেছে। মাটি থেকে তার মাথাটা তুলে দিয়ে সরু একটা কঞ্চির ডগায় স্থাপন করলাম। কেবল তাই নয় নিজের বোতল থেকে কিছুটা জল তার উপর ছিটিয়ে দিলাম। সেই দিন থেকে সেই ফুলটি অন্য সব দেশী-বিদেশী ফুলের থেকে আমার কাছে অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠল ; হয়ে উঠল আমার বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু তাকে নিয়ে মনে সংশয় ছিল। রাস্তার খুব গা ঘেঁসে বেড়ে ওঠা আমার নতুন বন্ধু কারোর অসাবধানতায় বা কারোর ইচ্ছাকৃত অত্যাচারের শিকার না হয়, কারোর পদতলে দলিত না হয়। ভগবানের কাছে তুলে ধরা অনেকগুলি প্রার্থনার সঙ্গে নতুন বন্ধুর দীর্ঘজীবি হওয়ার প্রার্থনাও যুক্ত হল সেই দিন থেকে। এর পর থেকে আমি প্রত্যহ স্কুল যাবার সময় তাতে জল সিঞ্চন করতাম। মাঝে মাঝে বাগানের মালির থেকে লুকিয়ে জৈবসার আনতাম কেবল তার মুখে একটু খাদ্য দেবার আশায়। দিনে দিনে ফুলটি বড়ো হতে লাগল, তার রং ঝলমলিয়ে উঠল পৃথিবীর বুকে। তার পাপড়ির ঔজ্জ্বল্য এবং সুমিষ্ট সৌরভে প্রজাপতির দলের ভিড় বাড়তে লাগল। একদিন অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখার পর আমার মনে হয়েছিল সে মাথা তুলে বাঁচতে শিখেছে। অন্য আর পাঁচটা মানুষের মতো সে তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। নতুন বন্ধুর এই বাঁচার তাগিদ আমার হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করল। কিন্তু একদিন

ঘটে গেল ঘটনাটা, যা এতদিন আমার মনে সংশয় হিসাবে ছিল, তা অচিরেই বাস্তবায়িত হয়ে গেল নিঃশব্দে, নির্বিঘ্নে। একদিন আমার স্বহস্তে প্রতিপালিত সেই ফুলটিকে দেখবার জন্য অনেক বায়না করে মা ও বাবাকে নিয়ে এসেছিলাম, মা বিরক্তি বোধ করছিলেন কিন্তু, বাবা রাজী হয়েছিলেন। অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে যখন ফুল প্রদর্শনীর জন্য আমি উদগ্রীব, তখন সহসা স্বস্থানে তার অনুপস্থিতি দেখে আমার উৎফুল্লতা স্তম্ভিত হয়ে গেল। বারবার চারিদিকে দেখতে লাগলাম আমি সঠিক স্থানে এসেছি কি না। কিন্তু দেখেছিলাম সঠিক স্থানেই এসেছি কিন্তু ফুলটি আর বেঁচে নেই। পাগলের মতো সকলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এখানে আগাছার দলের মধ্যে যে ফুলটি ছিল সবচেয়ে বড় সেটি কোথায় ? কেউ উত্তর দেয়নি বরং আমাকে পাগল বলে গণ্য করেছিল। তারপর নিকটবর্তী চায়ের দোকানে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম পৌরসভা কর্তৃক আগাছা পরিস্কার করা হয়েছে সমগ্র অঞ্চলজুড়ে। আমি হঠাৎই কেঁদে উঠেছিলাম। জানি না কী তার কারণ ? এত সহস্র মনোরঞ্জনকারী ফুল ছেড়ে আমার ভালোবাসার কেন্দ্রে স্থান নিয়েছিল এই নাম না জানা আগাছার ফুলটি। যার জন্য আমি অশ্রু মোচনও করেছিলাম। তারপর স্কুলে না গিয়ে বাবা-মার সাথে বাড়ি ফিরে এলাম। সারাদিন ধরে কেবলই তার ছবি আঁকলাম, এরপর ক্রমে স্কুল পরিবর্তন হল, বাবা ট্রান্সফার হলেন। কিন্তু সেই রাস্তার ফুলটিকে আমি ভুলতে পারলাম না।

আজ, বহুবছর পর আমার সন্তান বিট্টু এইরকমই একটি ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হল। সে আমাকে যখন সেই ফুলটি দেখাতে চাইল তখন আমি তাকে বাড়িতে আনতে বললাম। কারণ প্রানপ্রিয় কোনো ক্ষুদ্র জিনিসের বিচ্ছেদেও মনে যে প্রকার শোক উপস্থিত হয় তা অসহনীয়। হঠাৎই দেখলাম বিট্টুও সেইরকমই অবিকল একটি ফুল তুলে এনেছে সেই একই রকম বেগুনী রং-এর একই রকম সৌরভময়। টবের উপর তাকে স্থান করে দিয়ে আমি যেন আমার পুরানো বন্ধুর স্মৃতি-অনুভব করলাম। ফিরে পেলাম আমার সেই পুরানো লালীকে। নামটি এতদিন উহ্য করে রেখেছিলাম, আজ প্রকাশ করলাম।

প্লাস্টিক দূষণ ও তার প্রতিকার

অমৃতা প্রামাণিক
সহ-অধ্যাপিকা (ভূগোল বিভাগ)

ভূমিকা ঃ মানষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সৃষ্ট ক্ষতিকর পদার্থ ও তা নির্গমনের কারণে স্বাভাবিক পরিবেশের উপর প্রভাব পড়লে তাকে দূষণ বলে। অর্থাৎ পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে এমন পদার্থ বা দ্রব্য মানুষের কাজকর্মের ফলে সৃষ্টি হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলা যায়।

প্লাস্টিক দূষণ হল পরিবেশে প্লাস্টিক পদার্থের সঞ্চয়, যা পরবর্তী কালে বন্যপ্রাণী, তাদের আবাসস্থল, এমন কি মানবজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। আগে বাজারে ক্রেতারাই থলে নিয়ে যেতেন। কিন্তু এখন মাছ-মাংস, ফুল, সবুজ শাকসব্জীসহ সব জিনিসই বিক্রেতারা ছোট ছোট প্লাস্টিকে করে দিচ্ছেন। ব্যবহারের পর প্লাস্টিকগুলি যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সেই প্লাস্টিক পুকুর, নদী, খাল, বিল, নালা ইত্যাদিতে পড়ে দূষণ বাড়াচ্ছে। শহর ও শহরতলীতে প্লাস্টিকের কাপ, প্লেট অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইভাবে নিয়মিত প্লাস্টিক পদার্থের ব্যবহার প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। পলিথিন ব্যাগ, কসমেটিক প্লাস্টিক, গৃহস্থালির প্লাস্টিক ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের বেশির ভাগই পুনঃচক্রায়ন হয় না। এটি এমন এক রাসায়ণিক পদার্থ যা পরিবেশে পচতে কিংবা কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ (recycling) করতে প্রচুর সময় লাগে। ফলে পরিবেশে দীর্ঘদিন থেকে এটি বর্জ্যের আকার নেয় ও পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।

সাধারণতঃ উদ্ভিদকূল, জলজ প্রাণী ও দ্বীপ অঞ্চলের প্রাণীরা প্লাস্টিক বর্জ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ প্লাস্টিক বর্জ্য ঐ সকল প্রাণীর খাদ্য সংগ্রহের স্থান, বাসস্থান ও উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র উদ্ভিদ বা জলজ প্রাণী নয়, মানুষ ও প্লাস্টিক দূষণের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

প্লাস্টিক দূষণের জন্য দুই ধরণের প্লাস্টিক দায়ী। মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং ম্যাক্রোপ্লাস্টিক।

মাইক্রোপ্লাস্টিক ঃ যে সকল প্লাস্টিক বর্জ্যের আকার ২ মিলিমাইক্রন থেকে ৫ মিলিমিটার এর মধ্যে সেগুলিকে মাইক্রোপ্লাস্টিক বর্জ্য বলে। ম্যাক্রো বর্জ্য ভেঙ্গে গিয়ে মাইক্রোবর্জ্যে পরিণত হয়। মাইক্রোবর্জ্য খুব ক্ষুদ্র আকারের হওয়ায় দ্রুত পরিবেশের সাথে মিশে যায় এবং ফিল্টার ফিডিং জীবগুলি, এগুলো গ্রহণ করতে পারে।

ম্যাক্রোপ্লাস্টিক ঃ সাধারণতঃ ২০ মিমি আকারের চেয়ে দীর্ঘ হলে তাদের ম্যাক্রো বর্জ্য বলে। এগুলোর মধ্যে প্লাস্টিক মুদির থলে অন্যতম।

পরিবেশের ওপর প্রভাব ঃ

প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপত্তির স্থান থেকে বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্র স্রোত, বাতাসের অসম গতি ইত্যাদি কারণে এই বর্জ্যগুলি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বাহিত হয়। যেহেতু প্লাস্টিক একটি অপচ্য পদার্থ, তাই সৃষ্টির পর পুনঃচক্রায়ণ না হওয়া পর্যন্ত এটি পরিবেশে থেকে যায়। ফলে এর মাইক্রোকণাসমূহ নিয়মিত প্রাণীদের খাদ্যচক্রে ঢুকে পড়ছে যা বিভিন্ন প্রাণীদের জন্য খুবই বিপদজনক। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই প্লাস্টিকের ছোট ছোট সামগ্রী ক্যারিব্যাগ ইত্যাদি নদীনালার মুখ আটকে নিকাশী ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকা বহুদিন ধরে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে।

মাটিতে প্লাস্টিক দূষণ ঃ ক্লোরিনযুক্ত প্লাস্টিক রাসায়ণিক পদার্থ নির্গত করে যা ভূগর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের সাথে মিশে যায়। ঐ জল পান করলে আমরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকি। মাটিতে বিভিন্ন ধরণের অণুজীব বাস করে, যেমন সিউডোমোনাস, নাইলন খাদক ব্যাকটেরিয়া, ফ্লাভো ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। এগুলি প্লাস্টিক অণুর ভাঙনে সাহায্য করে। এই সকল ব্যাকটেরিয়া "নাইলোনেজ" নামক এনজাইম ক্ষরণের মাধ্যমে নাইলন অণুকে ভেঙে ফেলে। জীবাণু দ্বারা এই সকল প্লাস্টিক ভাঙনের মাধ্যমে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় যা এক প্রকার গ্রীনহাউস গ্যাস। এই গ্যাস বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী।

মানুষের উপর প্রভাব ঃ

প্লাস্টিক পদার্থে প্রচুর পরিমাণে রাসায়ণিক রঞ্জক মেশানো হয়। এই সকল রঞ্জক কারসিনোজেন হিসাবে কাজ করে ও মানুষের এণ্ডোক্রিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মানুষ এখন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পানীয় জলের সাথে পলিপ্রোপিলিন, নাইলন, পলিইথিলিন টেরেফথ্যালেটও গ্রহণ করছে। গবেষকগণ ইনফ্রারেড মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক অনুসন্ধান করেছেন। দেখা যায় যে, প্রতি লিটার জলে গড়ে ১০.৪ টি করে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যায় যার আকার মোটামুটি ০.১ মিলিমিটার মাত্রার। যেসব ব্র্যাণ্ডের জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে Nestle pure life E - Puraর মতো আরও বিখ্যাত সব ব্র্যাণ্ড।

প্রাণীকূলের উপর প্রভাব ঃ

প্লাস্টিক দূষণ প্রাণীকূলের বিশেষতঃ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। কিছু সামুদ্রিক প্রজাতি যেমন সামুদ্রিক কচ্ছপের পাকস্থলীতে বিজ্ঞানীরা প্রচুর পরিমাণে

প্লাস্টিক বর্জ্য পেয়েছেন। এরকম পরিস্থিতি হলে ঐ সব প্রাণী ক্ষুধায় ভোগে কারণ প্লাস্টিক বর্জ্য তাদের পরিপাক তন্ত্রকে বন্ধ করে দেয়। ফলে প্রাণীর মৃত্যুও ঘটে। অনেক সময় সামুদ্রিক প্রাণী প্লাস্টিক জাল দ্বারা জড়িয়ে মারা পর্যন্ত যেতে পারে। সামুদ্রিক কচ্ছপ সাধারণতঃ জেলিফিশ, সামুদ্রিক কীট ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। জেলিফিশের আকার ও আকৃতি প্লাস্টিক ব্যাগের মত হওয়ায় কচ্ছপ ভুল করে প্লাস্টিক ব্যাগ খেয়ে ফেলে, ফলে তাদের খাদ্য নালিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং খাদ্য গ্রহণ করতে না পারায় ধীরে ধীরে তারা মারা যায়। এছাড়া সামুদ্রিক তিমি ও ছোট মাছের পাকস্থলীতেও প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক পাওয়া যায়। তাই প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির কাছে একটা হুমকি স্বরূপ। এছাড়াও গৃহপালিত পশুপাখিরাও এই ধরণের ব্যাগ খেয়ে বিপদ বাড়িয়ে দেয়।

পাখীর উপর প্রভাব ঃ প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব শুধুমাত্র সামুদ্রিক মাছের উপর নয়, সামুদ্রিক পাখীর উপরও রয়েছে, কারণ সমুদ্রে ভাসমান প্লাস্টিক ও মাছের মধ্যে তুলনা করতে পারায় পাখীরা প্লাস্টিক গ্রহণ করে। প্লাস্টিক পদার্থ থেকে বিষাক্ত রাসায়ণিক পলিক্লোরিনেটেড বায়োফেনল নির্গত হয় যা পাখীদের দেহের টিস্যুকে ধ্বংস করে ও তাদের দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ধীরে ধীরে পাখীর মৃত্যু ঘটে।

সমুদ্রের জলে প্লাস্টিক দূষণ ঃ ২০১২ সালে এক গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে সমুদ্রে আনুমাণিক ১৬৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য রয়েছে। এর পরিমাণ প্রতি বছর বেড়েই চলেছে।

জাপানের ইওসুকায় অবস্থিত "জাপান এজেন্সী ফর মেরিন -আর্থ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি"র একটি আবিষ্কারে দেখা যায় যে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সমুদ্রখাত যার গভীরতা ১০,৮৯৮ মিটার সেই মারিয়ানা ট্রেঞ্চের তলদেশেও প্লাস্টিক ব্যাগ রয়েছে। মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে ওয়েস্টার্ন নর্থ প্যাসিফিকই সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। সেখানে প্রতি এক বর্গ কিমিতে সর্বোচ্চ ৩৩৫টি প্লাস্টিক আইটেম পাওয়া গেছে। সমুদ্রের ৭ - - ১০ কিলোমিটার গভীরে বসবাসকারী ৯০টি ক্রাস্টাসিনের দেহের ইন্টোস্টিনাল ট্র্যাকে বিভিন্ন ধরণের সিন্থেটিক ফাইবার খুজে পাওয়া যায় যার মধ্যে রেয়ন, লিওসেল এর মত মাইক্রেফাইবার রয়েছে। এগুলি দিয়ে নাইলন, পলিথিন ব্যাগ তৈরীর মেটেরিয়াল পলিথিলিম, প্লাস্টিকের পাইপ তৈরীর মেটেরিয়াল পি.ভি.সি ইত্যাদি তৈরী হয়।

প্লাস্টিক নিয়ে নেচার জার্নালে আরেকটি আশঙ্কাজনক গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে আর্কটিক তথা সুমেরু অঞ্চলের বরফে এখন রেকর্ড পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক হল প্লাস্টিক ডেবরিস থেকে বের হওয়া অতি ক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপিক কণা যা প্লাস্টিক আবর্জনার ভাঙনের ফলে তৈরী হয়। ২০১৪-১৫

সালে সেন্ট্রাল আর্কটিক থেকে নর্থ আর্কটিকের পাঁচটি আলাদা আলাদা স্থান থেকে বরফের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রতি লিটার বরফে ১২০০০ এর মত মাইক্রোপ্লাস্টিকের কণা রয়েছে, ইনফ্রারেড স্পেকট্রোমিটার দিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়, অগভীর সাইবেরিয়ান অঞ্চলের সমুদ্রের বরফে পাওয়া যায় জাহাজের রং ও ফিশ্ নেট থেকে আসা নাইলন ওয়েস্ট এর পার্টিক্যাল। এই অঞ্চলে পুরানো শিপিং ও ফিশিং ইনডাস্ট্রিগুলোর কারণেই এত বেশী মাইক্রোপ্লাস্টিক আর্কটিক অঞ্চলে গিয়ে জমছে। বরফ গলে যাবার পর এই প্লাস্টিক পার্টিক্যালগুলো বরফ মুক্ত হয়ে পড়ে এবং সামুদ্রিক শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া এই প্লাস্টিক পার্টিকেলে কলোনি তৈরী করে মহাসাগরের গভীরে ডুবিয়ে দেয়। উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিকের প্রায় ৭০% গভীরে জলের মাছই এই মাইক্রোপ্লাস্টিক খাচ্ছে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক মাইক্রোবিড থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। আমাদের টুথপেস্ট, ফেস স্ক্রাব, ফেসওয়াশ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ওয়াশিং মেটেরিয়াল-এ এরকম মাইক্রোবিড দেওয়া থাকে যাতে আমাদের স্কিন, জামাকাপড় ভালভাবে পরিস্কার করা যায়। এগুলোর আকার ১ মিলিমিটার হয় এবং বিভিন্ন পরিস্কারক দ্রব্যে এগুলোকে সহজেই বোঝা যায়। আমাদের ব্যবহারের পর এগুলো জলের সাথে মিশে গিয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম হয়ে শেষে সমুদ্রেই পড়ছে।

এবার একটু মহাসাগরগুলোর দিকে তাকানো যাক। সেখানে দেখা যাবে প্লাস্টিক পদার্থের সঞ্চয়ে সেখানে বিশাল বিশাল গারবেজ প্যাচ তৈরী হয়েছে। এই রকমই এক বিশালাকার গারবেজ প্যাচ হল প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত গ্রেট প্যসিফিক গারবেজ প্যাচ, যার আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এই অঞ্চলে যে পরিমাণ প্লাস্টিকের অংশ রয়েছে তার ভর প্রায় ৮০ হাজার টন। ফেলে দেওয়া ফিশিং নেট থেকে শুরু করে প্লাস্টিক বোতল, এমনকি টয়লেট সিটও এখানে পাওয়া যায়। এই প্যাচের সবচেয়ে বেশী স্থান দখল করে আছে মাইক্রোপ্লাস্টিক যেগুলি 0.5mmএর চেয়েও ছোট।

এই গ্রেট প্যাসিফিক গারবেজ প্যাচ ছাড়াও ইণ্ডিয়ান ওশান গাবেজ প্যাচ, নর্থ আটলান্টিক গারবজে প্যাচ, সাউথ প্যাসিফিক গারবেজ প্যাচ নামে আরও তিনটি মেরিন গারবেজ প্যাচ রয়েছে। ভারত, বাংলাদেশসহ ভারত মহাসাগরের সংলগ্ন দেশ থেকে আসা প্লাস্টিক নিয়ে গঠিত হযেছে ইণ্ডিয়ান ওশিয়ান গারবেজ প্যাচ। এই বিষয়ে কোন প্রতিকার না করলে আগামী ১০ বছরে মহাসাগরে প্লাস্টিকের তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই প্লাস্টিকের ভর সকল সামুদ্রিক মাছের ভরের চেয়ে বেশী হবে।

এ তো গেল মহাসাগরগুলোর অবস্থা। এখন দেখি বিগত কয়েক দশক ধরে কি হারে প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। ১৯৬৪ সালের পর প্লাস্টিক উৎপাদন ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। আর বর্তমানে এটি বছরে হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৩ মিলিয়ন টন। এভাবে চলতে থাকলে ২০ বছর পর এই উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। আর ২০৫০ সালে এটি প্রায় চারগুণ হয়ে যাবে। কারণ উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল প্রকার দেশই মাত্রাতিরিক্তভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার করছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে প্লাস্টিক কেবল মহাসাগরে হারিয়ে যাচ্ছে না, সেই সঙ্গে নিঃশেষিত হচ্ছে বিশাল পরিমাণে ফসিল ফুয়েল যা এইসব প্লাস্টিক তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে তেলের মোট গ্লোবাল কনজাম্পশনের 6% ব্যবহৃত হয় প্লাস্টিক উৎপাদনের কাজে। প্লাস্টিকের ব্যবহার এইভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে তেলের মোট গ্লোবাল কনজাম্পশনের 20 শতাংশ যাবে এই প্লাস্টিক উৎপাদনের কাজে।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে বিশ্বের উদ্যোগ ঃ

বিগত বছর অর্থাৎ ২০১৮র ৮ই ও ৯ই জুন কানাডার লা মালবেতে অনুষ্ঠিত হয় ৪৪তম G7 সম্মেলন। কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে Group of seven তথা G7 গঠিত হয়। এই সম্মেলনে এই সাতটি দেশের প্রধানসহ বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, হাইতি, নরওয়েসহ ১২টি দেশের প্রধানগণ, ইউনাইটেড নেশনস্, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ইন্টরন্যেশনাল মানিটরি ফাণ্ডের প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান G7এর ওশিয়ান প্লাস্টিক চার্টারে সাক্ষর করেনি, অথচ এই আমেরিকাতেই প্রতি বছর ৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে মাত্র ২৪ শতাংশ পুনঃচক্রায়ন হয়ে থাকে। বাকী ৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৩.৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য আকারে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়।

এটা পরিস্কার যে আমরা মহাসাগরে যে বর্জ্য ফেলছি তাতে মহাসাগরের পরিবেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিজ কীটনাশক সার ও শিল্প বর্জ্য মিলে মহাসাগরের অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে, সেখানকার প্রাণের ক্ষতি করছে। তার উপরে রয়েছে প্লাস্টিক যা মহাসাগরীয় মোট বর্জ্যের ৭০ শতাংশ। যাই হোক প্লাস্টিক সমস্যাটি সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা যার মোকাবিলা করতে হবে সকল রাষ্ট্রকেই। তাই কোন একটি দেশের একক পদক্ষেপের জন্য যথেষ্ঠ নয়। উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত প্রত্যেকটি দেশকেই এখানে এগিয়ে আসতে হবে। আর তাই G7 সম্মেলনের মত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলো এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে অনেকগুলো রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে ঐক্যমতে পৌঁছাবে ও নির্দ্দিষ্ট কিছু চুক্তি সকলেই স্বাক্ষর করে সে উদ্দেশ্যে নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করবেন।

প্লাস্টিক দূষণ কমাতে কয়েকটি দেশের নানা পদক্ষেপ ঃ

প্লাস্টিক সমস্যা সমাধানের জন্য যেটা সব থেকে বেশী প্রয়োজন তা হল বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক ভাবে প্লাস্টিক ব্যাগসহ বিভিন্ন আইটেমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা। রাষ্ট্রসংঘ অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্যের দূষণ কমিয়ে আনতে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ খুব শীঘ্রই "একবার ব্যবহারযোগ্য" এমন প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করতে চলেছে। খাদ্যপণ্যের "ওয়ান টাইম প্যাক" বানানোর জন্য ব্যবহৃত 'স্টিরিওফোম' শ্রীলঙ্কা নিষিদ্ধ করছে। আবার জৈব পদ্ধতিতে পচানো যাবে এমন ব্যাগ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে চীন। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে প্লাস্টিক ব্যাগের উপর ট্যাক্স চালু করা হয়েছে যা অনেকটাই সফল পদ্ধতি। আবার ক্যামেরুনে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে প্রতি কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহে অর্থ প্রদানের নিয়মও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশে চোরাপথে প্লাস্টিক ব্যাগ ঢুকছে। অর্থাৎ প্লাস্টিক বিষয়ে বিধি-নিষেধ থাকলেও সেগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বড় ধরণের ঘাটতি রয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কর ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করে সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করাই সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এই দূষণ কমাতে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব নিতে বাধ্য কবা, রিসাইক্লিংয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়াসহ ব্যবসায়ীদের বিস্তৃত সহযোগিতাও প্রয়োজন।

এসব পদক্ষেপ ছাড়াও নদী ও সমুদ্রে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিকের প্রবাহ কমাতে অনেক কিছু করা প্রয়োজন। অনেক দেশ প্লস্টিক বর্জ্য কমাতে ভালো ভালো নীতি নিলেও প্রয়োগের ঘাটতির জন্য তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে।

ভারতের পদক্ষেপ ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ই জুন। এবারর থিম 'প্লাস্টিক দূষণকে পরাস্ত করুন।" এবারের আয়োজক দেশ ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতি বছর পরিবেশ দূষণ রোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ৫ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করে। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর ও রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে ও জনসচেতনা মূলক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পুরসভা ছোট প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কাছে আবেদন করেছে। প্লাস্টিকের ব্যাগ এদিক ওদিক ফেলা বন্ধ করার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বকখালির দুটি সমুদ্র সৈকত ও দীঘার সমুদ্র সৈকত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রচার অভিযান করা হয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গার দুই পাড়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু জায়গা করে দেওয়া হবে যেখানে বিভিন্ন আবর্জনা ফেলতে হবে। এই ব্যাপারে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পুরসভাগুলির সাথে আলোচনা করে নির্দ্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি তৈরী করেছে।

এছাড়া ভারত সরকারের খাবার জল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মন্ত্রণালয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে খাবার জল প্রদানের জন্য প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার বন্ধ করতে বলেছেন এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছেন যে এমন উপায়ে খাবার জল প্রদান করতে হবে যাতে কোন প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টি না হয়। সিকিম রাজ্য সরকারী অনুষ্ঠান ও সভায় প্লাস্টিক বোতল ও স্টাইরোফোম দ্রব্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। বিহারেও সরকারী সভায় প্লাস্টিক বোতল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই প্লাস্টিক দূষণ হ্রাস করতে যথেষ্ঠ উদ্যোগী হয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু কিছু সুপার মার্কেটে প্লাস্টিক ব্যাগের মাধ্যমে দ্রব্যাদির আদান-প্রদান হ্রাস পেয়েছে এবং তারা বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ ব্যবহার করছে। বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক এক প্রকার বায়োপলিমার যাদের পচন ঘটে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কম্পোস্টারের মধ্যে। গৃহের কম্পোস্টার দ্বারা বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থসমূহের কার্যকরী ভাবে পচন ঘটে না এবং এর ধীর গতির কারণে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়।

যদিও বায়োডিগ্রেডেবল ও ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকগুলো প্লাস্টিক দূষণ রোধে সহায়তা করে, এর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। একটা সমস্যা হল এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব একটা কার্যকরী ভাবে ক্ষয় হয় না। তেলভিত্তিক প্লাস্টিকগুলো একটি ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজিত হয়, কিন্তু এর পরে তারা ক্ষয়ীভূত আর হয় না।

ভস্মীকরণ ঃ ব্যবহৃত প্লাস্টিক মেডিকেল সামগ্রীর মধ্যে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ল্যাণ্ডফিলের বদলে চুল্লীতে ভস্মীভূত করা হয়, যাতে রোগের ব্যাপ্তি কমে আসে। ফলে মেডিকেল সামগ্রী থেকে আসা প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়।

প্লাস্টিক দূষণের এই সমস্যা সমাধান করা খুব সহজ নয়। এখন তেলের দাম অনেক কম হওয়ায় পুরানো প্লাস্টিককে রিসাইকেল্ করার চেয়ে নতুন প্লাস্টিক উৎপাদন করাটা সাশ্রয়ী হয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বে ইকোনমি বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সমান তালে প্লাস্টিকের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর তাই প্লাস্টিক রিসাইক্লিং এর জন্য ব্যাপক উৎসাহ

তৈরী করা যাচ্ছে না। তবে এর কিছুটা সমাধান আসতে পারে যদি কি ভাবে প্লাস্টিককে আমরা বাবহার করব, এটা নিয়ে সাধারণ মানুষ নতুন করে ভাবে। প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার যদি কমিয়ে ফেলা হয় এবং আমরা যতটা সম্ভব প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করি তবে প্লাস্টিকের চাহিদা অনেক কমে আসবে এবং সেই সাথে উৎপাদনও কমে যাবে। প্লস্টিক উৎপাদকরা এমন ভাবে প্লাস্টিক তৈরী করতে পারেন যাতে একে পুনর্ব্যবহার করা যায়। এছাড়া এরা পচনযোগ্য প্লাস্টিক তৈরী করতে পারেন।

প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, তাই উপযুক্ত বিকল্পের ব্যবস্থা না করে হঠাৎ করে প্লাস্টিকের ব্যবহার পুরোপুরি ভাবে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়, আবার সেই বিকল্প দ্রব্যকেও যথেষ্ঠ সস্তা হতে হবে। প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার পুনঃচক্রায়ন ও পচনশীল প্লাস্টিক উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান করতে সক্ষম হব। সমাধানের এই পথগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী ঠিক একদিন ধীরে ধীরে প্লাস্টিক দূষণ থেকে রক্ষা পেতে পারবে।

"ভালোবাসায় সব কিছু হয়, জোর করে কায়দায় ফেলে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না।" — শ্রীমা সারদাদেবী

'স্মৃতির সরণী বেয়ে.....'

প্রাক্তনী সংসদ

'আমাদের বিদ্যাভবন, সে যে সব হতে আপন।'

স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনে পাঠ শেষ করেছি সে অনেকদিনের কথা। কিন্তু ফেলে আসা সেই দিনগুলোর স্মৃতি আজও মনের মাঝে উজ্জ্বল। কলেজ পত্রিকার জন্য তাই 'আমাদের বিদ্যাভবন' শিরোনামে আমরা ক'জন প্রাক্তনী ছোট ছোট স্মৃতিচারণার একটি মালা গেঁথে দিলাম আমাদের প্রাপ্তি, অনুভব ও কৃতজ্ঞতার স্পর্শ দিয়ে।

স্মৃতির সরণী বেয়ে...

আমার বিদ্যাভবন

জয়া চক্রবর্তী (প্রাক্তণী)

সাল ১৯৭৫। আগস্ট মাসের বর্ষণক্লান্ত এক বিকেল। বাবার সঙ্গে এক অষ্টাদশী প্রবেশ করলো উঁচু পাঁচিলে ঘেরা গেট দিয়ে। চোখে এল জল। মনে হলো পাঁচিল যেন জেলখানার মত। কলেজটার নাম সবাই বলতো 'সারদা কলেজ'। সেই প্রাঙ্গনেই কাটিয়ে দিল তিন বছরেরও বেশী কিছু সময় সেই তরুণী। আশ্চর্যের কথা, প্রথম দিনের মতই আত্মজন বিচ্ছেদের ব্যথায় বিক্ষত হৃদয় ও চোখভরা জল নিয়েই বিদ্যাভবন থেকে বিদায় নিয়েছিল সে।

কিন্তু কি পেলাম পাঠকালীন সময়টুকুতে ? সাম্মানিক স্নাতকের একটি শংসাপত্র! সে তো সব কলেজেই পাওয়া যায়। তবে কি বিশেষত্ব এই বিদ্যাভবনের, যা সারা জীবন আমাদের দিগদর্শন করে চলেছে ?

প্রথম দিনেই শ্রদ্ধেয়া অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী বাবাকে বলেছিলেন,— 'আপনি বাড়ী যান, ও এখন আমাদের মেয়ে—আমাদের দায়িত্ব! এই কথাতেই কি নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন আমার বাবা! আর আমি! কিভাবে যেন বিদ্যাভবনের সবকিছু আপন হয়ে উঠলো! ভোরবেলার সমবেত গীতাপাঠ, সান্ধ্যপ্রার্থনা, একসাথে সব কাজ, হাতে হাতে পরিবেশন, ঠাকুরঘর ও বাগানের কাজ, জীবনে একসাথে চলার সেই প্রথম পাঠ।

বৈদিকমন্ত্র— 'ওঁ সহনাববতু..... দিয়ে কলেজ শুরু, মহাপুরুষদের বাণীপাঠ, বিদ্যার্থী হোমের মন্ত্র, সবই প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক পরিবেশকে মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া চারিদিকে সবুজ গালিচা, রকমারি ফুলের রংবাহার, তারই মাঝে সুশৃংখল পঠন পাঠন, আমাদের দুষ্টুমি আর দিদিদের স্নেহমিশ্রিত শাসন এ যেন অন্য এক পৃথিবী, বাইরের কোলাহল আর দুষণমুক্ত।

আর কতরকমের অনুষ্ঠান, সরস্বতী পূজা, বার্ষিক উৎসব, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুনর্মিলন উৎসব, এসবের মধ্যে দিয়ে নিজেকে মেলে ধরা, বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের এমন সুযোগ খুব কম কলেজেই পাওয়া যায়। ভারতবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, ও দায়িত্ববোধের ভিত এসময়েই গড়ে উঠেছিলো। আজও তাই জোর দিয়ে বলতে পারি জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে ভয় না পেয়ে মোকাবিলা করা, নিজেকে সর্বক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়া— এসবই সম্ভব হয়েছে বিদ্যাভবনের শিক্ষার গুণে। সামাজিক পরিচয় ব্যতীত আমার বড়ো পরিচয় আমি বিদ্যাভবনের মেয়ে—স্বামীজীর মেয়ে।

বিদ্যাভবনের প্রতি ভালবাসা আমাদের এই স্মৃতিচারণার প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট। আর এক প্রাক্তণী ইভা মন্ডলের অনুভব—

"আমাদের জীবন যেন কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ ফাগুনের পালা। কত না স্মৃতি সেখানে ভিড় করে আছে। বিদ্যার্থী হয়ে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু শুধু বিদ্যা অর্জনই নয়, তার সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও চারুকলার বিভিন্ন অঙ্গনে মনের আনন্দে বিচরণ করেছি। এটা সম্ভব হয়েছে বিদ্যাভবনের প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার সঙ্গে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মেলবন্ধনের ফলে। শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আদর্শায়িত পথে নিজেদের চালিত করে সমৃদ্ধ করতে শিখেছি— আমাদের সংসারের ঘুর্ণাবর্তে পথ চলতে ধ্রুবতারার মত দিক নির্দেশ করে। জীবনের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বিদ্যাভবনে কাটানো মাত্র তিনটে বছর শুধু কয়েকটা সামান্য অসামান্য ঘটনার স্মৃতিমাত্র হয়ে থাকেনি, বরং ভিতরে ভিতরে কখন যেন চলার পথের পাথেয় হয়ে গেছে। সেই সময়ে এতটা উপলব্ধি করতে পারিনি-এখন অনুভব করি। সর্বোপরি পেয়েছি জীবনের অমূল্য সম্পদ—বন্ধুত্ব। তাইতো জীবনের এত টানাপোড়েন, সময়ের হিসেব নিকেশ, দূরত্বের অজুহাত, কোন কিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনা। —ছুটে যাই আমাদের সেই আকৈশোরের সাথী বিদ্যাভবনে।"

আনন্দময় সব স্মৃতি, মানুষকে অনেক দুঃখ থেকে ত্রান করে। যত বয়স বাড়ছে ততই পিছনপানে চাওয়ার ঝোঁকও বেশী হচ্ছে। তাই এখন দেখি সুমনা চৌধুরী কি লিখছেন—

প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, চাওয়া, পাওয়ার এই দ্বন্দমুখর জীবনের সব না পাওয়াগুলো তুচ্ছ হয়ে যায় তখনই, যখন মনে ভাবি, আমি বিদ্যাভবনের প্রাক্তণী। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় আমি কাটিয়েছি এখানকার শুদ্ধ, মুক্ত, পবিত্র বাতাবরণে। অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মনিষ্ঠ আবাসিক জীবনযাত্রা যে সবসময় মন থেকে গ্রহণ করতে পারতাম, তা বললে ভুল হবে। তবু আজ মুক্তমনে বারবার কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি সেই আশ্রমের শিক্ষাকে যার জন্য আজও জীবনে 'ভাল মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে' — মন্ত্রে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাই অন্তর গভীর হতে।

নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর পড়া (সাম্মানিক দর্শন) তো ছিল প্রচুর। সেখানে কোন ফাঁকির স্থান নেই। তার সাথে পেয়েছি বিচিত্র বিষয়ে অবাধ বিচরণ করার সুযোগ, এবং সবটাই ছিল আনন্দের সঙ্গে খোলামনে। রান্নাঘরে তরকারী কাটা বা রুটিবেলা, রুটিন মাফিক করতে গিয়ে কত যে মজা আর আনন্দ লাভ হতো তার হিসাব নেই। বিদ্যাভবন আমাদের দিয়েছে অশ্রান্ত চাঞ্চল্যের মাঝে নির্মল আনন্দলাভের সন্ধান।

ছোট্ট পরিসরে পারস্পরিক প্রীতি ও মেলবন্ধন ছিল দৃঢ়। আজও ৪৩ বছরে সেই মিত্রতা অটুট। শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকাদের সুচিন্তিত পাঠদান, তার সাথে সাংস্কৃতিক চেতনার জাগরণ আমাদের সমৃদ্ধ করতো। পূজনীয়া মাতাজীদের শাসন ও স্নেহের মিলিত ধারায় নবীন প্রাণ আমরা ভেসে যেতাম। আজও বিদ্যাভবনের আকাশ, বাতাস, আমাদের প্রাণে ঢেউ তোলে। সরল প্রাণে, খেলার ছলে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতি আমাদের অন্তরের সম্পদ। আমাদের বড় ভরসার স্থল এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, এই সুষমামন্ডিত মহাবিদ্যালয়, তার আশ্রমিক পরিবেশ ও পূজাগৃহের দিব্যত্রয়ীর পূতসান্নিধ্য। তাই তো— বারেবারে ছুটে আসি, বিদ্যাভবন, তোমায় বড় ভালবাসি।

বিদ্যাভবন আমাদের, আমরা বিদ্যাভবনের, এরচেয়ে বড় সত্যি আমাদের কাছে আর কিইবা হতে পারে। বিদ্যাভবনের সোনালী স্মৃতি যতই বলা বা লেখা হোক, তার 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে'.....

আর এক প্রাক্তণী অমিতা ব্যানার্জীর কলম ছন্দে কথা বলেছে— তার 'অনুভব' আমরা ভাগ করে নিই—

'তোমার কাছে এসেছিলাম বিদ্যাভবন
তিনটি বছর বড় মধুর
আজ যদিও সেটি সুদূর।

তবু আজও তুমি আমার বড় আপন।
সোনায় মোড়া দিদিমনি
এমন বন্ধু! ভাগ্যমানি
ত্রয়ীর আশীর্বাদে ঘেরা
আজ যে গো মোর জীবনখানি।
তোমার দানেই আজও চলি
অনেক বাধা কাটিয়ে ফেলি
মধু মালতীর গন্ধ যে পাই
দূরের থেকে আজও তাই
ওগো মোদের বিদ্যাভবন
তুমিই শেখালে সংগচ্ছধ্বম্'।।

"বিদ্যাভবনের দুটি স্মরণীয় দিন"

রিনীতা মুখার্জী
দ্বিতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগ (সাম্মানিক)

জীবনের পথে চিরচলমান
হে সংগ্রামী পথিক —
যে পথে চলেছিলে তুমি সদা,
হে অগ্নিকন্যা;
পাহাড় তোমাকে টলাতে পারে না,
বরফ তোমাকে গলাতে পারে না,
আগুন তোমাকে পোড়াতে পারে না,
নিজ সংকল্পে তুমি চিরস্থির

এবারে ভগিনী নিবেদীতার সার্ধশতবর্ষে তাঁর জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিদ্যাভবনে অসাধারণ সুন্দর কিছু সময় কাটালাম।

ভগিনী নিবেদীতার ১৫০তম সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী পালিত হল বিদ্যাভবনে। ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর এ উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় স্তরে একটা যুব সম্মেলন হয়েছিল। সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত চলত অনুষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুব-প্রতিনিধির সঙ্গে একসাথে থাকা, খাওয়া ও আনন্দ উপভোগ করার অপূর্ব অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথমবার। এত সুন্দর পরিবেশ, এত সুন্দর আমাদের বয়সী বিভিন্ন ভাষাভাষি মেয়েদের উপস্থিতি ও এত সুন্দর অনুষ্ঠান আর কোনোদিন উপভোগ করতে পারব কিনা জানিনা। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন পোষাকের মাঝেও নিজেকে কখনো আলাদা মনে হয়নি। অতুল প্রসাদ সেনের লেখা — "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন ও মহান" — কথাটি খুব মনে পড়ছিল।

২৫শে অক্টোবর এলাম বিদ্যাভবনে। আমরা যারা আবাসিক ছাত্রী তাদের ওপর ভার পরেছিল বহিরাগত যুবপ্রতিনিধিদের আপ্যায়নের। ভাঙা ভাঙা হিন্দি এবং ইংরাজিতে আমরা দারুন সফলভাবে অতিথি আপ্যায়ন করেছিলাম। প্রথম দিন মানে ২৫শে অক্টোবর বিদ্যাভবনে

এসে অতিথিদের সাদর আমন্ত্রনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল আমার দিনটি। পরদিন ভোরে উঠে আমি ও আমার বিভিন্ন সঙ্গী ও আরো অন্যান্য দিদিরা একসাথে মিলে অতিথিদের নিয়ে গেলাম মন্দিরে। সেখানে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া প্রদীপ্তপ্রাণা মাতাজী বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে, মন্ত্রগুলির সুন্দর ব্যাখ্যার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন দিনটি। তারপর আমাদেরই বিদ্যাভবনের তৃতীয় বর্ষের অস্মিতাদির সুন্দর একটি ভজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছিল। বহিরাগত অতিথিরাতো ছিলেনই সাথে আমার কিছু বান্ধবীরা ও কিছু দিদিরাও এই অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে ভোরের এই অনুষ্ঠান ছিল শুধুই আবাসিক প্রতিনিধিদের জন্য। তারপর আমরা সবাই আমাদের প্রাতঃরাশ সেরে মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে সিস্টার নিবেদিতার ছবিতে ফুল প্রদান করেন শ্রী সারদামঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারন সম্পাদিকা প্রঃ অমলপ্রাণা মাতাজী। এরপর আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া ভাস্বরপ্রাণা মাতাজী তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন।

এরপর হিন্দি, ইংরাজী ও বাংলায় ভগিনী নিবেদিতার জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রদ্ধেয়া ভার্গভী দিদি ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। তারপর শ্রদ্ধেয়া সত্যনিষ্ঠপ্রাণা মাতাজী হিন্দিতে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেছিলেন এবং সবশেষে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া বেদরূপপ্রাণা মাতাজী মানে আমাদের নিবেদিতা দি ভগিনী নিবেদীতার জীবনী সম্পর্কে বাংলায় বক্তব্য প্রদান করেছিলেন খুব সুন্দর, সহজ এবং সরল ভাষায়। তবে আমাদের সকলেই তেমন কোনো গুরুগম্ভীর ভাষা প্রয়োগ করেননি যা আমাদের বোধের বাইরে। ভগিনী নিবেদিতার সম্পর্কে এত তথ্য জানতে পেরে আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছিলাম। এরপর হয়েছিল কুইজ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন দেখেছিলাম ভগিনী নিবেদিতার ওপর। এরপর বাইরে আসা অতিথিদের কিছু নাচ, গান, আবৃতি এবং অভিনয় দেখলাম। তারপর দুপুরের খাওয়া সমাপ্ত করে আবার অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। তারপর বিকালে চা ও হালকা কিছু টিফিন করে সন্ধ্যায় ভজনে যোগদান করলাম। এবং তারপর আবার অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। শেষ হতে হতে প্রায় ৮:৩০ বেজে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের পর অতিথিদের নিয়ে এসেছিলাম রাতের খাবার খাওয়ানোর জন্য। তাদের পরিবেশন করার একটা অদ্ভুত এবং সুন্দর অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে কখনই ফিকে হয়ে যাবে না। একদিকে যেমন তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের ভাষা বুঝতে পারছেন না, অন্যদিকে আমরা ওনাদের ভাষা বুঝতে পারছি না। তবে তার মধ্যেই বাংলা, হিন্দি, ইংরাজীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ করে কথা বলেছিলাম আমি। আমার ঐ ভাষার নাম যে কি সেটা আমি বুঝতে পারিনি। তবে এতো ভালো লেগেছিল যে সেকথা বা অনুভুতি কারো কাছে প্রকাশ করার মতো নয়। যাই হোক এভাবেই দিনটির সমাপ্তি হল। পরদিন সকালে আবার

একইরকম ভাবে মন্দিরের সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের দিন শুরু হল। অনুষ্ঠানের শুরুতে নিবেদীতার জীবনীর উপর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া প্রদীপ্তপ্রাণা মাতাজী; শ্রীমতি গঙ্গা দি তারপর শ্রদ্ধেয়া দিব্যনন্দপ্রাণা মাতাজী এবং তারপর ধনব্রতপ্রাণা মাতাজী। তারপর আবার অতিথিদের বিভিন্ন ভাষায় গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি প্রদর্শন করলেন তাঁরা। এরই মধ্যে আমরা আমাদের দুপুরের খাওয়া শেষ করে ফেললাম। তারপর কখন যে বিকাল হয়ে এল বুঝতেই পারলাম না। তারপর ভজন হল এবং আবার অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। আর এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই অনুভব করেছিলাম কিছু বোঝা এবং না বোঝা ভালোলাগা। এই কয়দিন যেন বিদ্যাভবন আর 'বিদ্যাভবন' রইল না। এটি ক্রমশ 'বিদ্যানন্দভবনে' পরিণত হল। আমাদের বিদ্যাভবনের মাতাজী এবং ব্রহ্মচারিণী দিদিরা তো আমাদের আপনজনই জানি তবে বাইরে থেকে আসা মাতাজী এবং ব্রহ্মচারিণী দিদিরাও যে এতটা আপন হতে পারে মাত্র কদিনে, তা সত্যি কোনোদিন ভাবিনি। সত্যিকথা বলতে কি সকল মাতাজী এবং ব্রহ্মচারিণী দিদিরা সত্যিই আমাদের নিজেদের একান্ত আপনজন। এই কয়দিন আমাদের বিদ্যাভবন যেন একটা সুন্দর পারিবারিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছিল। আর যাদের কথা না বললে পরিবারের সকল সদস্যদের কথা উল্লেখ করা হয় না তাঁরা হলেন আমাদের কৃষ্ণকলি দি এবং স্বাতীদি যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সারাদিন ধরে। বিশেষ করে কৃষ্ণকলিদি, যাঁর অবদান এই বিদ্যাভবনে অফুরন্ত। তিনি আমাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করেছেন এবং নিজের দিদির মতই সবার খেয়াল রেখেছিলেন। সব দিদি এবং আমরা যারা এই অনুষ্ঠানটির সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সাহায্য করেছিলাম তারা সবাই মাতাজীর কাছ থেকে অনেক ভালো ভালো বই এবং আরো অনেক কিছু উপহার পেয়েছিলাম। শুধু আমরা নয়, এই বিদ্যাভবনের দাদারাও তাঁদের সারাদিনের পরিশ্রমের জন্য এবং আনন্দের ভাগিদার হিসেবে উপহার পেয়েছিলেন।

এই কটাদিন যে বিদ্যাভবনে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। মনে হচ্ছিল এই আনন্দের রেশ যেন না হয় শেষ। তবে যাই হোক এই কটাদিন আমার স্মৃতিতে কখনই ফ্যাকাশে হয়ে যাবে না। সারাজীবন মনে রয়ে যাবে এই বিদ্যাভবনের কিছু সুন্দর মুহূর্ত এবং স্মৃতির চিলেকোঠায় হানা দিয়ে আপন মনেই কথা বলবো এবং হেসে উঠবো।

"এক টুকরো স্মৃতিকথা"

মৌসুমি ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগ

গল্প লেখার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু না, গল্প লেখা আমার দ্বারা হবে না। কেননা, ভগবান আমার মধ্যে কবি কল্পনার বাষ্পটুকুও দেননি। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। কিন্তু রূপকথার রাজকন্যা বা পক্ষীরাজ ঘোড়া ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিলেও তারা নিমেষেই কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তাই শৈশবের নিষ্পাপ স্মৃতির ঢেউগুলির মধ্যে অগোছালো ভাবে ভাসতে ভাসতে আমি পানকৌড়ির মতো ডুব দিয়ে খুঁজে এনেছি আমার জীবনের টুকরো টুকরো ছবি।

তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। গ্রীষ্মের প্রখরতা যখন সমস্ত কিছু গ্রাস করছে, সেই প্রখরতা অচিরেই কাটিয়ে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম হিমের দেশ দার্জিলিং-এ। তারিখটা ছিল ১৩ই জৈষ্ঠ্য, বুধবার। সেদিন বিকেলের পড়ন্ত রোদে মা-বাবার সঙ্গে আমি বেরিয়ে গেলাম দার্জিলিং-এর পথে। আমাদের ট্রেনটা ছিল বিকাল ৫ টায়। আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে আমরা অবশেষে উঠে গেলাম ট্রেনের সপ্তম কামরায়। ট্রেনে উঠতেই আমার মনটা পড়েছিল ট্রেনের জানলার দিকে। ভোরবেলা আমাদের ট্রেন পৌঁছাল জলপাইগুড়িতে। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে উঠে পৌঁছোলাম আমাদের গন্তব্যস্থল, দার্জিলিং-এ। ওখানে আমরা একটি হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নিলাম। পরদিন ভোরবেলা আমরা বেড়িয়ে পড়লাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্খায়।

পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা পৌঁছোলাম টাইগার হিলে। সেখানে দেখলাম তুলোর মতো ভেসে থাকা মেঘের মাঝ থেকে যেন এক টুকরো সূর্যের আলো উঁকি দিচ্ছে। সমস্ত সৌন্দর্য দুচোখ ভরে উপভোগ করার পর চলে এলাম সেই বিখ্যাত Tea Garden-এ। সেখানে আমরা ওদের পোষাক পড়লাম, ছবি তুললাম। তারপর দেখলাম কচি কচি চা পাতার ওপর সূর্যের মৃদু আলোর ছটা। দার্জিলিং-এর এই প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন আমার শৈশব মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যেন মনে হচ্ছিল স্বর্গের দেবতাদের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। তারপর চোখ পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে আসা ঝর্ণার দিকে। ঝর্নার জল যেখানে পড়ছিল তার পাশ দিয়েই সারি সারি কাগজ ফুলের গাছ, যেন মনে হচ্ছিল কেউ সারি দিয়ে গাছগুলিকে লাগিয়েছে স্বযত্নে, কেবলই শোভাবর্ধন করার জন্য।

পরদিন আমরা ঘুরলাম নানা মন্দির, গেলাম "THUPTEN SANGAG CHOLING MONASTERY DARJEELING"। তারপর চাপলাম 'Toy Train'-এ, খুব ভালো লাগছিল পুরো দার্জিলিং ঘুরতে। বাইরের দৃশ্য দেখে আমার যেন মনে হয়েছিল কেউ যেন তুলির টানে তার স্বপ্নের দেশ এঁকেছে।

১৭ই জৈষ্ঠ্য, আমরা গেলাম সিকিমে। দার্জিলিং-এ যে বিষয়টিতে আমরা ফাঁকি দিয়েছিলাম, সিকিমে এসে সেই রোপওয়েতে ওঠার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারপর আমরা গেলাম সিকিমের সবথেকে বড়ো বুদ্ধ মন্দিরে। সেখানকার পূজাকৌশলের মধ্যে যেন আমাদের পূজার কৌশলই আনাগোনা দিচ্ছিল, যেন ভেসে আসছিল ভারতের সেই প্রাচীন সুর — বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

এসবের মধ্যে দিয়েই আমাদের বাড়ি ফেরার দিন নিকটে চলে এল। সকালবেলা ঘরের সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিতেই যেন আমার মনে হল এক অপূর্ব সৌন্দর্যের বন্ধনে আমি জড়িয়ে পড়েছি। যেতে না ইচ্ছে হলেও তবুও যেতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম। জানলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও আমার মনটা পড়েছিল সেই স্বপ্নের দেশ দার্জিলিং-এ।

পরিচয়

সুমনা সিংহ

তৃতীয় বর্ষ (সাম্মানিক) বাংলা বিভাগ

দিনের পর দিন কেটে চলে, কোনোদিন রতন ভরাপেট খেতে পায় আবার কোনোদিন আধপেটা খেয়েই চলে তার। কিন্তু একদিন কি রতনের কেউ ছিল না, এখন ও কি কেউ নেই ? সে কথা এখন থাক।

রতন এখন এক হোটেলে উচ্ছিষ্ট বাসন পরিস্কার করার কাজ করে, মাইনে তার মাসিক ১৫০ টাকা। কিন্তু এ কাজ কী সে স্বেচ্ছায় নিতে চেয়েছিল? অন্য পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচার শখ কি তার ছিল না? তার কি ইচ্ছা ছিল না যে সে পড়াশোনা শিখবে, বড়ো হয়ে মায়ের পাশে দাঁড়াবে, মায়ের ইচ্ছা পূরণ করবে? মাকে সব অপমানের থেকে আড়াল করবে, মায়ের সান্ত্বনার আশ্রয় হবে ? কিন্তু কেন হয়নি ? কেন তার এই দূরাবস্থা ? না সে কথা এখন থাক।

প্রতিদিন তাকে ভোর চারটে বাজতে না বাজতে উঠে পড়তে হয়, সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়। উপরন্তু কাজের একটু ত্রুটি হলেই মালিকের চোখ রাঙানি আর মুখ ঝামটা দিনের পর দিন অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে। কোনোদিন সে ভেবেছে পালিয়ে যাবে, খোঁজ করবে তার মায়ের। কোথায় তার মা, হয়তো এই বড় শহরে খুঁজলে তার সন্ধান সে পাবে না, কিন্তু সন্তানের মন কি সেই কথা মানে ? আশায় বেঁচে আছে রতন। তার মা কোথায় গেল সেও তো সে জানে না। কি করবে সে, কার কাছে শুনবে তার মা কোথায়? কি হল তার মায়ের সে কথা এখন থাক।

মা হারিয়ে যাওয়ার পর সে কত মিনতি করেছে তার বাড়ির লোকের কাছে, তাকে যেন তাড়িয়ে না দেয়। কে শুনল তার কথা, মা চলে যাওয়ার দুদিন পরেই তাকে তাড়িয়ে দিল তারা। সে বরাবরই দেখে এসেছে তার মা অন্য সবার থেকে আলাদা। কেউ তার মাকে ভালোচোখে দেখত না, এড়িয়ে চলত সব সময়, একটা দূরত্ব রেখে চলত। কিন্তু কেন তার মায়ের প্রতি সকলের এই অবহেলা। সে শুধু এটুকুই জানত তার মা সকলের চেয়ে ভাল, আলাদা। সবাই বলত তার মায়ের নাকি লিঙ্গ আলাদা, কিন্তু লিঙ্গ কি তার মানে সে বুঝত না। রতনের কাছে তর মা-ই সব ছিল। সে মাকেই কারা যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

রতনের মায়ের শখ ছিল তার ছেলে বড় হয়ে চাকরি করবে, তার পাশে দাঁড়াবে। স্কুলেও

তো ভর্তি হয়েছিল রতন। সমাজ তাকে পড়তে দিল না। মায়ের আশা পূরণ করতে দিল না। এখন সে এক সামান্য কাজের লোক মাত্র। সবাই বলে মা নাকি তার নিজের নয়। মা আবার আপন পর কি ? মা তো মা-ই হয় এটাই রতনের বদ্ধমূল ধারণা।

তার সমবয়সী এক ছেলের কাছে একদিন রতন জানতে চাইল 'আমার মা কোথায় বলতে পারিস ?' সে বলল 'তোর মা আবার কি রে ? সে কী তোর মা নাকি রে, সে তো তোকে পুষেছিল ছেলের শখ পূরণ করার জন্য, নইলে সে তো এক .....

এই পর্যন্ত বলে পল্টু হাসে। তাতে রতনের কষ্ট আরও বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে পল্টুর উপর তার দারুণ ক্রোধও হয়। ইচ্ছা হয় তাকে পারলে মেরেই ফেলে। আবার সেই সঙ্গে তার অভিমান হয় তার মায়ের উপরেই। কেন তার মা তাকে ছেড়ে চলে গেল। তার মা কী তাকে একটুও ভালবাসে না? তার কথা তার মায়ের কী একবারও মনে পড়ে না? রতনের এইসব ভাবনার ফাঁকে পল্টু আবার বলে, 'বুঝেছিস রতন তই তোর মার কথা ভুলে যা। ওই আমাদের হোটেলে এক মেমসাহেব রোজ আসে দেখেছিস? সবাই বলে তার সাথে নাকি তোর মুখের খুব মিল। আমি বলে দিচ্ছি দেখে রাখিস ওই মেমসাহেব তোর কেউ হবে বুঝলি ?' একথা শুনে রতন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বলে 'আমি আমার মাকে খুঁজে পাচ্ছিনা আর তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস ?'

পল্টু বলে 'না রে রতন ঠাট্টা নয় রে। মালিক, আর সবাই বলে ওই মেমসাহেব নাকি তোকে দেখার জন্যই রোজ এই হোটেলে আসে। আর কোন খাবার না খেয়েই হোটেলে টাকা দিয়ে চলে যায়। — মালিক তো তাকে সেইজন্যই পুষেছে রে।'

রতন ভাবে সবাই স্বার্থপর। কেবল নিজের কারণেই সবাই তাকে ব্যবহার করে।

তবে হ্যাঁ, একথা সত্যিই ঠিক ওই মেমসাহেব রোজ রতনকে দেখতেই এই হোটেলে আসে। তবে এ ঘটনার বিরতি দিয়ে এখন পুনরায় রতনের মায়ের কথায় ফিরে আসা যাক। হ্যাঁ, এবার বলা যেতে পারে, রতনের মা সত্যিই একজন খাঁটি মানুষ। নইলে কী কেউ পরের ছেলেকে আপন ছেলের মত ভালবাসা দিয়ে পালন করতে পারে ? তবে একথা ঠিক যে রতনের মা সাধারণ আর পাঁচটি মানুষের মত নয়। লোকে তাকে হিজরা বলে ..... সমাজ তাকে দূরে ঠেলে রেখেছে। রতনের এসব বোঝার বয়স তো এখনও হয়নি। ছোটো বয়সে সংসারের মলিণতা তাকে এখনও স্পর্শ করতে পারেনি, তাই এসব বোঝার ক্ষমতাও তার হয়নি। সংসারের কদর্য পাঁক তাকে এখনও গ্রাস করতে পারেনি। তাই সে মানুষকে মানুষ বলেই ভাবতে পারে ও ভালবাসতে পারে।

রতনের মা নাকি এখন কোন্ ঘরানার, দু-চার জন নাকি তার মাকে দেখেওছে তার দলবলের সঙ্গে গ্রামে বেরোতে। কিন্তু হায়! .... রতনের মাকে তো আর সেই মা বলে মনে হয় না। সে কত পাল্টে গেছে। একদিন কি রতনের মায়ের আশা ছিল না রতন পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ? তার একটা সুন্দর সংসার হবে, সমাজের সেবা করবে। কিন্তু, সমাজ তার ব্যঙ্গ দৃষ্টি দিয়েই রতনের মাকে দেখল। তার পায়ে সমাজ নির্দ্দিষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যের বেড়ি পরিয়ে দিল। এগোতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। সব স্বপ্ন তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল এক নিশ্বাসে। এখন লোকে তাকে দেখলে পরিহাস করে। পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে সে।

সমাজের এক কদর্য লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয় কে বোঝাবে বালক রতনকে? কোন্ মুখেই বা সমাজ জবাব দেবে রতনকে ? এখন অসহায় রতনের পাশে কে দাঁড়াবে কেউ তার উত্তর জানে কী ? নাকি এই হোটেলের উচ্ছিষ্ট বাসন পরিষ্কার করেই দিন যাবে তার, পূরণ হবে না কোন আশা। আর পাঁচটা হতভাগা ছেলের ভাগ্যের মতই তার ভাগ্যও জুড়ে যাবে তাদের সাথে ? এখন সমাজই দিতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর।

হ্যাঁ, একদিন রতনের মা-ই রতনকে রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ করেছিল। লোকে ঠিকই বলে রতনের মা তার নিজের নয়। কিন্তু রতনের মা আসলে যে কে তাও কী কেউ জানে না? প্রত্যেকদিন যে মেমসাহেব রতনকে দেখার জন্য হোটেলে হাজিরা দেয় এবং বিনা কারণে হোটেলের মালিককে টাকা দিয়ে যায়, তার কী বুকের ভেতর যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় না? তার মাতৃত্বের স্নেহ জেগে ওঠে না? সে কথা একমাত্র মেমসাহেবই জানেন, আর জানেন স্বয়ং ঈশ্বর।

Jaipur — 'a Splendour in Pink'

Rhitobrita Chakraborty

3rd Year (Honours) English.

The mere mention of the word "Rajasthan" transports one to a land immensely rich in culture, history and art. Signifying the "abode of rajas", the land is a citadel of romance and chivalry associated with the Rajput culture. Everything about Rajasthan fascinates be it miles of golden stretches of sand or opulent palaces or the crowd in multi-hued costumes.

Displaying such an aura of Rajasthani splendour is Jaipur, the picturesque capital of Rajasthan. This year I had the opportunity to visit such a place during my college vacation. As I was travelling in Rajasthan with my family, stopping at various famous spots of that state like Jodhpur, Jaisalmer, Mount Abu, Pushkar and many others, spending one to two days at each destination, Jaipur was our last stop. Situtated in the eastern part of the state, Jaipur is in the only planned city of Rajasthan. Its uniqueness is the pink boundary which gives it its name "pink city"- a colour associated with hospitality in Rajput culture. Built by Maharaja Sawai Jaisingh ; the city is meticulousy planned on accordance with the pinciples of town planning laid down in Shilpa Shastra, a treatise on Hindu acrchitecture.

Jaipur established its recognition as a versatile tourist destination as it offers superb fortresses, serene temples, amazing havelis and royal palaces. If you are a lover of culture and architecture, like me, then you would surely love this royal place. Jaipur is also well known for its handicrafts and the amazing collection of jewelleries. I had only two days in hand to spend in this royal city before I had to hop into the flight and come back to my city. I tried to utilise these two days as much as I could. For the first day we thought of covering all the tourist spots and for the last day of our twelve day tour we visited some of Jaipur's famous market places, such as, Bapu bazar, Johari bazar, Chandpole bazar and such others to buy some souvenirs to take back home with us.

I have visited the royal city nearly two months ago, but its architectural splendour still flashes through my mind. The historical palaces and forts which gives the glimpse of old Indian architectural design also manifests all the royal richness and grandeur. One of its exponent is the Amer Fort which is located about 11 kms from the main city of Jaipur. Also known as the Amber Fort, it displays a spectacular amalgamation of both the Hindu and Muslim architecture in its structure. Apart from its majesctic surroundings, the red sandstone and white marble pavilions are the most delightful experience of this fort.

Another stupendous sight that Jaipur offers its tourists is the well-known Hawa Mahal or the palace of winds. This achitectural structure is a five storied building located at the southern part of the Jaipur city amidst the bustilng market of Johari Bazar. The building contains a well designed museum depicting the past and present of the city and it looks most captivating during the morning when the golden rays of the sun hits the colourful structure.

My visit to Jaipur was amazing and I am sure you will also equally enjoy this place as much as I did. Make sure you don't miss the must seen places of Jaipur. Shopping was the other most interesting part of my visit ; in fact, it was a real treat for me. Jaipur is also the right place for photographers to capture the beauty and culture of this historically rich city. If you really want to know about the roots of Indian culture and tradition, then you must visit this place. So plan your trip, hop into a jet or a train and prepare yourself to take a tour of a lifetime of this pink city.

The Rise of Feminism

Akanksha Krishnatre

1st Year (Honours) English.

Feminism is one of those words, which is either advocated with full enthusiasm by an individual or completely avoided by other. This dilemma in its acceptance within the various layers of society originates and thrives either on the ignorance of the public or the mistreatment of its real meaning. Before delivering too deep into what is the reason behind the debate on feminism, we need to understand the basics of the term.

What was the beginning of feminism like as a movement ? It is found that after the French Revolution and Suffragist movements the women were starting to become conscious of their circumstances, which in noway were acceptable. They started with the demand of equal rights and right to vote. The same instance took place in colonised America after its war with the empire. The women were not allowed to cast vote for a long time and they upon noticing the mistreatment decided to fight back.

It can be noticed that the demand for equal rights had become the norm down the centuries. Here, in history it was quite apparent that the society in its very fundamental nature was Patriarchal and women were supposed to remain in the lower strata of the societal conventions. Hence if the origin of the term 'feminism' is to be traced, linguistically it corresponded to the upliftment of women. The men stood on a higher pedestal and the feminists did not wish to bring them down, but to educate and empower women, to stand as equals, and the term echoed that emotion.

If a case study is conducted around the globe, we would find the need for equality became clear to more and more women. A few years ago a girl from Pakistan called Malala Yusafzayi stood for the education of girls and women in her country, and as a result an attempt on her

life was made. If that single instance does not speak for what feminism is and why the world is in dirc need of it, then nothing does.

Emma Watson, a famous Hollywood actress and one of the leading faces of feminism in her speech at UN pointed out, that in a world where equality is still not found on the basis of gender, it is not a world where peace and development can reign. Even in recent times when we talk of equality, it can be noticed that in a man and woman having the same degrees, the former would be paid more.

The portruyal of women in media often glorifies the ever present stock character of love and damsel in distress; where on the other hand bold movies like "Anarkali of Arah" and "Angry Indian Godesses" faces criticism.

When the topic of women's rights makes its appearance known, it is very important to consider that the reservation of bus seats, quota in education or the allowance of visiting a temple are not needed or asked for. Equal rights begin with the education of public. It refers to the fact that the paycheck of people having same qualification should be equal, despite gender. The portrayal in media should focus on the development of character rather than all the lens on the physique. The songs which are blasphemous to say the very least, should have less sexist underlying meaning to it, like 'Fevicol se', 'Gandi Bat' etc. The Rape culture where the victim is always blamed has to be abolished and remarks from eminent figures about the dressng or physique of the victim, in media, should be abolished. This is what equality in all its colours denotes.

Another important distinction that needs to be differentiated more clearly is between 'Feminism and Feminazi'. Often when people are afraid to relate their names with feminism, it is in the fear of being marked as a Feminazi. A Feminazi is defind as a person who hates men and does not believe in equality but in the aspect that women are superior to men. This ideology goes opposite to the ideology of equality preached through feminism.

In the recent times a movement called as Metoo took the internet and media by storm. Started a few years prior in America it reached

India, like every other movement, through media and social platform In its very essence, the movement is a very remarkable step for t sexually harassed or abused to come forward and share their sto in order to remind the world that sexual harassment is still prevale Another remarkable feature of the movement is that in no way it alig itself to a gender and tries to stay true to the ideology of feminis

Although being a Feminist movement, Metoo has been in some wa weaponised by the Feminazi too in their attempt to prove their poi Stories that were fabricted to tarnish the image of certain emine personalities also came to light. This kind of step, jeoparadises the ve idea and battle that is raging on.

Feminism is not about being better than someone, it is not abo standing taller, or higher in the social pedestal and it is definitely n about belitteling our fellow members. Feminism is about trying to sta shoulder to shoulder with men, bound by patriarchal rules. It is abo giving both genders, the ability, chance and place to express themselv and not praise one for it, while questioning the nature of other.

HEARTBREAKS

Sulagna Sarkar
2nd Year, English Honours

What does a broken heart feel like ? As I looked up in google I found this amazing answer which said "When your heart is broken, it can feel like the end of the world. No amount of pain has ever felt so agonizing or concentrated. It's like a giant hole that was pummelled into your chest, with no hope of repair." I think its absolutely true. All of us out here have gone through this feeling several times. I remember to have encountered this feeling when I was 5 years old. Someone told me that since then because I was going to have a sibling and he was to be the younger one he would be loved more. And my heart broke for the first time. My parents won't love me the same way they initially did. I had such a strange pain in my chest. I could not even express it to anyone. Whoever I told, thought I was just a kid and I still don't know why people thought that I was being cute then. I had my second heart break when I was in class three and I realized that I am not my best friend's best friend. I am sure we all know how much that hurts because we all have been in that situation in our life. The girl I thought to be my best friend started to sit with another classmate. I was no more her partner in school not even during our assemblies. I didn't say anything to her but came home and cried to my mom about it. My mother that day told me something which I think I wouldn't ever forget. She told me that whether a person reciprocates or feels the same way for us or not, shouldn't change our behavior towards them. Love is never wasted, for its value does not rest upon reciprocity. The next day I went to school and told her that she is still my best friend and just went and sat beside another friend. I tell you today she now calls me her sister, her family. After so many years and also even after school life we are in touch, sharing things about our daily life even though we are chasing different careers. That's how our friendship grew over the years.

I had my third heart break when I was in class 12. I met this amazing person whom I liked from the very first instance that we started talking. He

was an amazingly talented person with all the good qualities that I could look for in a guy. He genuinely made me happy and I loved spending time with him. But the one flaw which he had, was lack of commitment. Because of that, insecurities started creeping into my mind. And sadly I had to part ways with him. I couldn't continue with a nameless relationship. It felt so bad that I cried about it for days and it took me a long time to get over it. But never told him about it. I am still in touch with him. Saw him get engaged and still I am a very supportive friend to him. We never had a fight. I just moved away from him. Erasing my feelings for him. And as I said I don't give up on friendships and relationships.

What makes me strong are amazing people I have in my life who have supported me in such situations. My parents and my friends who have always stood by me ; I am ever grateful to them for their love which made these days so bearable. I am quite sure at some point even I have broken someone's heart. But I would like to say to those people that may be I did it unintentionally. And I am sorry for having caused pain because I know heartbreaks are never good or easy to deal with. The thing that is common for all heartbreaks is that even though it seems a damage beyond repair, it heals with time. We all get over heartbreaks and stand out strong again.

We mature and these heartbreaks build us into different persons altogether. We try not to trust the wrong person, to avoid getting too attached and do everything possible to save our heart from breaking once again. But you know what I believe, trust people, have strong bonds, get attached, love, and give all you have. Get your hearts broken otherwise you will never get to face the other side of life. There are two sides to every coin. Flip it and see what comes your way. Have a life with ups and downs because sunshine all the time doesn't feel good. At times we long to have a rainy day with our mother's special pakora and our favourite book or music and spend our day curled up in blankets.

" অনন্তবর্মা"

সাবেরী রক্ষিত
সহকারী অধ্যাপিকা (সংস্কৃত বিভাগ)

বিদর্ভ দেশের সার্থকনামা রাজা ছিলেন পুণ্যবর্মা। সমস্তরকম গুণের আধার এই পুণ্যবর্মার একমাত্র পুত্র ছিলেন অনন্তবর্মা। যিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই সুদীর্ঘজীবী পিতার প্রয়াণের পর বিদর্ভরাজপদে অধিষ্ঠিত হন। জন্মসূত্রে পিতার স্বভাবের গুণগত উৎকর্ষগুলি তাঁর মধ্যে অনুসৃত হয়েছিল। সহজাত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আকর-স্বরূপ ছিলেন তিনি। নৃত্য-গীতি-চিত্রকলা প্রভৃতিতে তাঁর ছিল অশেষ দক্ষতা। কাব্যিক প্রতিভার দীপ্তিতেও তিনি ছিলেন সমুজ্জ্বল। সজ্জন হবার মত সর্বপ্রকার গুণেই তিনি ভূষিত ছিলেন, কিন্তু রাজোচিত যে প্রধান গুণের কারণে একজন রাজা মহান হয়ে উঠতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই গুণটির-ই তীব্র অভাব ছিল তাঁর মধ্যে। সুরাজার প্রধান কর্তব্য হল সুশাসনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করা। এইজন্য অর্থশাস্ত্র বা দন্ডনীতির জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। অনন্তবর্মা এই রাজনীতিবিদ্যা থেকেই বঞ্চিত ছিলেন। এবং এই জন্যই অগ্নিতে অপরিশোধিত শোভাহীন সুবর্ণের মত সমৃদ্ধশালী হয়েও অর্থশাস্ত্রাদির জ্ঞানহীন অনন্তবর্মার বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়ে উঠতে পারেনি। এবং এই কারণেই সদসদ্‌বিবেকরহিত হয়ে তিনি নিজের ও স্বরাষ্ট্রের ভালমন্দ বুঝতে না পেরে নিজেই নিজের পতন ডেকে এনেছিলেন। আস্থানরূপ নলিনীর মধ্যে বকের মত ধূর্ত কিছু মন্ত্রী তাকে ঘিরেও ছিল, যারা সর্বদা রাজার মিথ্যা স্তুতিতে রাজাকে মোহিত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর থাকত। অনন্তবর্মার রাজসভাতেও আপাত বন্ধুবেশী শঠ ও কপট পরিষদের অভাব ছিল না। অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানহীন অনন্তবর্মা সহজেই তেমন দুর্জনের দ্বারা প্ররোচিত হতে হতে বিপথগামী হচ্ছিলেন দেখে তাঁর হিতৈষী মন্ত্রী বসুরক্ষিত নানাভাবে তাঁকে বিভিন্ন সদুপদেশ দান করেন। রাজা অবিবেচক হলে কিভাবে প্রজাদের কাছে অবমাননার পাত্র হয়ে ওঠেন, কিভাবে রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, শাস্ত্রজ্ঞানহীন রাজা কিরূপ নয়নাবিশিষ্ট হয়েও অন্ধতুল্য, কিরূপে শাস্ত্রানুসারী পথে চলে রাজা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীশ্বর হতে পারেন — এবংবিধ বিভিন্ন সদুপদেশে বৃদ্ধমন্ত্রী অনন্তবর্মাকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রবুদ্ধিহীন রাজা ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বে পড়ে খারাপটিকেই বেছে নেন এবং দুর্বৃত্ত, ছলনাপরায়ণ, স্বার্থপর, কুমন্ত্রণাদায়ী বাল্যবন্ধু বিহারভদ্রের কুপরামর্শে প্ররোচিত হয়ে তিনি সর্বস্ব খুইয়ে বসেন। অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান

অধিগত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ, দন্ডনীতিবিদ্যার চর্চা করা রাজার শরীর-স্বাস্থ্য ও সময়ের পক্ষেও মারাত্মক হানিকর, অত্যন্ত ক্লেশকর — ইত্যাদি বিপরীত কুযুক্তি দিয়ে বিহারভদ্র অনন্তবর্মার মগজ ধোলাই করেন। অনন্তবর্মা এমনিতেই যথেষ্ঠ সমৃদ্ধশালী — তীব্র ক্লেশ সহ্য করে দুরূহ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের সাধনা করে নতুন আর কী বা তিনি পেতে পারেন — এইরূপ কুমন্ত্রণা দান করে তাঁকে সর্বপ্রকারে বিভ্রান্ত করে, রাজ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাঁকে সর্বস্বান্ত করেন বিহারভদ্র। কেবলমাত্র রাজনীতির শাণিত বুদ্ধিটুকু না থাকার জন্য এইভাবেই অশ্মকরাজ বসন্তভানুর ক্ষুরধার কূটনীতিক জ্ঞানের কাছে পরাস্ত হয়ে অনন্তবর্মা ধনে প্রাণে নিঃশেষ হন।।

ভগিনী নিবেদিতার ভারতসেবা নারীবাদ ও নারী কল্যাণ

সোমা দাস

দ্বিতীয় বর্ষ, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ (সাম্মানিক)

ভারতবর্ষ এই নামটির সাথে জড়িয়ে আছে নানান মহীয়সী নারী ও পুরুষদের কথা। যাঁরা কালজয়ী হয়ে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের স্মরণীয় করেছেন নিজেরই অজান্তে ; নিজেদের সত্য, নিষ্ঠা, কর্ম-সেবা, মেধা, শিক্ষা, দেশপ্রেম ইত্যাদির মাধ্যমে। এদের মধ্যে সকলেই যে ভারতীয় তথা ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন, ভারতমাতার বক্ষে লালিত হয়েছেন তা নয়। এদের মধ্যে প্রাচ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের বহু ব্যক্তিবর্গ ও যাদের মধ্যে অন্যতম একজন রমণী হলেন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। ভারতসেবায় নিজেকে উৎসর্গকারিণী ভগিনী নিবেদিতা।

সুদূর আইয়ারল্যাণ্ডের এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নিবেদিতা। পিতা-মাতা নাম রাখেন মার্গারেট নোবেল। শ্রীরামকৃষ্ণ নামক পরশমণির স্পর্শে সিমলা পল্লীর নরেন্দ্রনাথ যেমন বিবেকানন্দে পরিণত হন তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ নামক পরশমণির ছোঁয়ায় মার্গারেট রূপান্তরিত হন ভারতভগিনী নিবেদিতায়।

সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করে স্বামীজী অনুভব করেছিলেন ভারতমাতার শৃঙ্খল তথা অন্ধকার মোচনের জন্য প্রয়োজন পুরুষ নহে দৃঢ় চেত্তা 'সিংহীর'। যা বর্তমানে ভারতমাতা প্রস্তুত করতে পারছে না। স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতের বাস্তব রূপদানের আশায় তিনি মার্গারেটকে ভারতে আহ্বান করেন।

বাল্যকাল থেকেই মার্গারেট তাঁর পিতামহ ও মায়ের কাছ থেকে ভারতের সুমহান-সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন এবং নিজের মনে ভারতবর্ষকে এক সুমহান উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছিলেন। তাই তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতবর্ষে আসতে দ্বিধাবোধ করেননি; তবে ভারতে আসার পূর্বে তাঁর প্রতি স্বামীজীর নির্দেশাবাণী ছিল, যদি তুমি ভারতের সভ্যতাকে, মানুষজনকে, সংস্কৃতিকে তার নিজের অবস্থাতেই ভালোবাসতে ও গ্রহণ করতে পারো তাহলে ভারত ও তোমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত তথা দীক্ষিতা মার্গারেট ভারতে আসেন। ভারতে তৎকালীন পরিস্থিতি তাঁর হৃদয়কে উদ্বেল করে তুলেছিল তিনি ভারতমাতার কালি মোচনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন নিঃস্বার্থে। ভারতের সংস্কৃতি, সভ্যতা, মানুষজ প্রত্যেকের সাথে তিনি একাত্মবোধ করতেন। স্বামীজী স্বয়ং তাকে নিয়ে সমগ্র উত্তর ভার পরিক্রমা করেন। বেদ বেদান্তে মর্মবাণীর মাধুর্য উপলব্ধিতে তাকে সাহায্য করেছিলে স্বামীজী। ভারতের নারীসমাজ ও অধ্যাত্মবাদের সহিত পরিচিত করানোর জন্য স্বামীজী তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদার পদপ্রান্তে।

ভারতীয় সমাজও সংস্কৃতির সাথে পুরোপুরি পরিচিত হওয়ার পর নিবেদিতাকে আর তার ভারতের বাসস্থান বাগবাজারের ১৬ নং বাড়িতে আটকে রাখা যায়নি। তিনি বাগবাজার সহ সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকনার সাথে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। শুরু হয় তাঁর ভারতসেবা তথা তাঁর ভারতপ্রেমের ও ভারত শ্রদ্ধার বাস্তব রূপদান।

তিনি স্বামীজীর স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগী হন। স্বামীজী বলেছিলেন যে দেশ নারীদের সম্মান করে না, সে দেশ ও সভ্যতা কখনই উন্নত হতে পারে না। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। স্বামীজীর এই উদ্দেশ্য মনে রেখে মার্গারেট প্রথম বাগবাজারে নিজগৃহে মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর নামকরণ হয় স্বামীজী কর্তৃক নিবেদিতা।

তিনি বাগবাজারে প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। মেয়েদে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। ধীরে ধীরে তিনি বাগবাজারের ১৬ নং বাড়িতে একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতেন **"মেয়ে তোমরা জপ করিবে, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, মা, মা মা"।**

মরণরোগ প্লেগ যখন সমগ্র কলকাতায় মহামারির আকার ধারণ করে, প্লেগ রোগে আক্রান্ত রোগীর কাছে যেতে যখন মানুষ কুণ্ঠাবোধ করতো, সেই মুহূর্তে মরণাপন্ন আক্রা ব্যক্তিদের নিজে হাতে সেবা করেছেন নিবেদিতা, দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন নোং বস্তিতে বস্তিতে। প্লেগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের পাশে বসে থেকেছেন মূর্তিময়ী দেবীর মত।

ভারতবর্ষের নানান দেবদেবী, পৌরাণিক চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন নিবেদিত যে কারণে তিনি ভারতীয় না হয়েও হয়ে উঠেছিলেন ভারতমাতার সুযোগ্য কন্যা।

তিনি অসহায় দরিদ্র অস্পৃশ্য মানুষদের প্রতি স্নেহময়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলে তাদের দুঃখ, কষ্ট, ব্যাথা, জ্বালা-যন্ত্রনার সাথী হয়েছিলেন। তাদের ব্যাথায় ব্যাথিত হয়ে নিবেদিতার হৃদয়। খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে তিনি সাহা

করেছিলেন হতদরিদ্র বহু মানুষকে। তিনি নিজের মুখের অন্ন, নিজের বস্ত্র অন্যের হাতে তুলে দিয়েও যেন পরমশান্তি অনুভব করতেন।

বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিবর্গকেও তিনি সাহায্য করেছেন। যারা পরবর্তীকালে কেউ কেউ খ্যাতি লাভের পর নিবেদিতার নাম উল্লেখও করেননি।

তিনি নন্দলাল বসুকে অজন্তার গুহা চিত্র নির্মাণে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেন। এছাড়াও তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু প্রমুখকে সাহায্য করেন। জগদীশ চন্দ্র বসুকে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' স্থাপনের জন্য সর্ব্বোচ্চ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। এছাড়াও বহু লেখক, সাহিত্যিককে তিনি সাহায্য করেছেন, অনেকের লেখার সংশোধনও তিনি করেছেন।

নিবেদিতার সেবার ক্ষেত্রের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তিনি বাংলার বিপ্লবীদলকেও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য একসময়ে বুকে পাথর চেপে নিজের কষ্টের উর্ধ্বে গিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিলো তাঁর গুরুর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন থেকে, ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁর সদস্যপদ।

রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য হিসাবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে তিনি সেবাকর্ম করেন। তিনি তাঁর গুরুর বাণী স্মরণে রেখেছিলেন। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর অর্থাৎ শিবজ্ঞানে জীব সেবা এই কথা নিবেদিতাকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। সেকারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলের দিকে তাঁর স্নেহপূর্ণ সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বহু নারীকে এবং পরবর্তীতে তারাও নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন ভারতসেবায় নিবেদিতার সহকর্মী হিসাবে।

নিবেদিতার তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতসেবা ও ভারতের কল্যাণে। ভারতের উন্নতিতে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। নিবেদিতার সেবা কর্ম ছিল সমগ্র বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত। শিক্ষিকা সরলাবালা দেবী নিবেদিতার স্মৃতিচারণে এক গ্রন্থরচনা করেন এবং তাকে লেখেন, কী জানি তাহার গুরুদেব কোন্ দীক্ষায় এই চিন্ময়ী ভারতের উপর মৃন্ময়ী প্রতিমার রূপ দেখিয়েছিলেন, যে তিনি ভারতের প্রতিটি ধূলিকণার সহিত আধ্যাত্মিক রসের আস্বাদন পাইতেন। নিবেদিতার মন ছিল ভারতের মানুষের উন্নতির জন্য চিন্তামগ্ন। তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ছিল ভারতীয়দের উন্নয়নকল্পে, পাশাপাশি তাঁর গুরুর স্বপ্নের ভারত রূপায়নের প্রচেষ্টা।

স্বামীজীর অকালমৃত্যুর পরবর্তীকালে স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতের কাণ্ডারির স্থান গ্রহণ

করেন নিবেদিতা। ভারত সেবায় তিনি আত্মবিসর্জন করেন। স্বামীজীর অসম্পূর্ণ কর্মকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন নিবেদিতা তাঁর সেবা, ধর্ম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে।

একজন বিদেশিনী হয়েও তিনি কীভাবে পরবাসী হয়ে ভারতবর্ষের সেবাকর্ম করেছেন, কীভাবে ভারত সেবায় নিজেকেই উৎসর্গ করেছিলেন তা দৃষ্টান্ত হিসাবে আজও সকল বিশ্ববাসীর হৃদয়ে লালিত। যে কারণে নিবেদিতা পরলোকগমনের এত দিন পরেও সকল বিশ্ববাসীর মননে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন নিজে কৃতী ও সেবাকর্মের মাধ্যমে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মাতাজী, ভগিনী নিবেদিতার জীবনী প্রসঙ্গে বলেছেন— জগন্মাতার প্রতি তাহার সাধনা প্রকাশিত হয়েছিল প্রতি ঘন্টায়, প্রতিমুহূর্তে ভারতসেবার মধ্য দিয়ে। ভারত সেবাই ছিল তার সাধনা এবং তাহার প্রভুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের সেবার স্পর্শ রেখেছিলেন এবং পাশাপাশি ভারতে ভগিনী হয়ে সার্থক করেছিলেন স্বামীজী প্রদত্ত ভগিনী নিবেদিতা নামটিকে। এই হল ভারতভগিনী নিবেদিতা। তিনি ভারতের প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে নিজেকে পরিণত করেছিলেন ভারতময়ীরূপে। এই হল নিবেদিতা ও ভারতসেবা। যা বক্তৃতা লেখার আকারে আজও প্রকাশ পেয়ে চলেছে বহু কথকের বাক্যরাশিতে, বহু লেখকের কলমে। যা আজও মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে সমগ্র বিশ্বসাসীকে ভারতের সেবার সাথে এই ভাবেই জড়িয়ে আছেন ভগিনী নিবেদিতা।

> আমাদের অনেকের নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তৃষ্ণার্তের নিকট সুশীতল পানীয়ের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এমন একজন মহান পুরুষ ছিলেন, তিনি ব্যর্থতার কথা কখনো কল্পনা করেন নাই। যাঁহার বাণীর মধ্যে নেতিবাচক কিছু ছিল না। তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন সবই প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। — ভগিনী নিবেদিতা

অন্ধকার জগতে আলোর দিশারী

মৌমিতা সাহা
দ্বিতীয় বর্ষ, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ,

'অন্ধকার' বলতে বুঝি যেখানে আলো প্রবেশ করে না, বা যেখানে আলোর অভাব। আমরা যদি এই আলোর ঝা চক্‌চকে শহরে একটু ভালোভাবে নিরীক্ষণ করি, তাহলেই অন্ধকারের কিছু ছিদ্র আমাদের সামনে চলে আসবে।

আমাদের সমাজে মানুষ প্রায় প্রতি অমাবস্যায় কোনো না কোনো দেব-দেবীর উপাসনা করে তমসা কাটানোর জন্য ; (যেমন-মহালয়া থেকে শুরু হয় মাতৃ আরাধনা, আবার দীপাবলীতে মা কালির উপাসনা) অমাবস্যার অন্ধকার কাটানোর জন্য প্রজ্বলিত হয় প্রদীপ।

বংশ উজ্জ্বল হবে তখনই যখন সেখানে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োগ ঘটবে। কুসংস্কার দূরীভূত হবে। আমাদের সমাজের শিক্ষিত মানুষ যখন সমাজের যথাযথ অন্ধকার চিহ্নিত করে সেখানে শিক্ষার আলো জ্বালাবেন তখনই সমাজ কুসংস্কার মুক্ত হয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

সমাজের উপরতলার রাজনীতি করা ব্যক্তি যে উদ্যমে শহরের নামী-দামী পুজোর উদ্বোধনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন, সেই উদ্যমটাই যদি তারা রাখেন শহরের অবহেলিত বস্তি বা ফুটপাত গুলিতে শিক্ষার দ্বীপ প্রজ্বলনে, তাহলে হয়তো আমাদের সমাজের কালিমা কিছুটা হলেও দূর হবে।

খবরের পাতায় যদি ধর্ষণের খবর জ্বলজ্বল করে স্ব-মহিমায় তাহলে তার সঙ্গে এই খবরও রাখা উচিত, কী করে এই অন্ধকার জগত থেকে মেয়েদের মুক্তি দেওয়া যাবে।

সমাজকে নিরাপত্তা দিতে হবে রাস্তার ধারে। ত্রি-ফলার আলোক বর্তিকা জ্বালিয়ে নয়। নিরাপত্তা দিতে হবে যথাযথভাবে খাদ্যের সরবরাহ, আত্মরক্ষার শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

"আলো- আলো নিয়ে এসো। প্রত্যেকের কাছে জ্ঞানের আলো নিয়ে এসো, যতদিন না সকলেই ভগবান লাভ করে, ততদিন তোমাদের কাজ শেষ হবে না। দরিদ্রের কাছে আলো নিয়ে চলো, ধনীর কাছে নিয়ে এসো আরও অধিক আলো— কারণ দরিদ্রের চেয়ে তার আলোর প্রয়োজন বেশী। .... এইভাবে সবার কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দাও— বাকি যা, তা প্রভুই করবেন, কারণ তিনিই তো বলেছেন, 'কাজেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।'

মোবাইল ফোনের রহস্য

ডঃ বিদিশা চ্যাটার্জী
অধ্যাপিকা, (দর্শন বিভাগ)

চার বন্ধু — মেঘা, শ্রী, টুপুর ও বৃষ্টি। চারজনেই শিক্ষকতার জগতের সঙ্গে যুক্ত একই জায়গায় পড়ান, আর কাকতলীয় ভাবে তারা সকলেই দক্ষিণ কলকাতায় থাকে সুতরাং রোজ সকলে এক সঙ্গে ফেরার জন্য আকুল হয়ে থাকে। গাড়ীতে যেতে যেতে আড্ডা, তার সঙ্গে কোনদিন সিঙারা খাওয়া বা কোনদিন গাড়ী থামিয়ে শর্মার দোকানে চা।

সেদিন ছিল একটা শুক্রবার। আজ চারজন বন্ধুরই মন ফুরফুরে।

মেঘা বলল, "বাবা। সেমেস্টারটা শেষ হল।"

সঙ্গে সঙ্গে বাকীরা বলে উঠল-- "যা বলেছিস। নামেই সেমেস্টার ছমাসের কোর্স হাতে সময় পাওয়া যায় সর্বসাকুল্যে চার মাস। তার মধ্যে সব পড়ানো শেষ করে পরীক্ষা নাও। নিজেরা সেমিনার অ্যাটেন্ড করো— উফ্ আর পারা যায় না।"

এইসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। আর গাড়ী ছুটছিল উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার দিকে। হঠাৎ বৃষ্টি বলে উঠল—"আজ কোথাও নেমে একটু স্যুপ খেলে হতো না ? খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।" ব্যস, সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"হ্যাঁ, বেশ হয় তাহলে। আর সঙ্গে একটু আড্ডা।'

ঠিক হল বাইপাসের কোন একটা রেঁস্তোরায় বসা হবে। ড্রাইভারকে নির্দেশ দেওয়া হল। সময়মত সেই রেঁস্তোরায় পৌঁছল সবাই।

তারপর যা হয়। কি খাওয়া হবে সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। হঠাৎ টুপুর বলে উঠল--'হ্যা রে, আমার মোবাইলটা দেখেছিস ? আমার তো হাতেই ছিল। এত গল্প করছি, যে কোথায় রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না।"

বৃষ্টি বলে উঠল—'সে কি! হাত থেকে পড়ে যায়নি তো?'

শ্রী বলল-- "আচ্ছা দেখি, রিং হচ্ছে কি না। Switch off থাকলে নিশ্চয় কেউ নিয়ে নিয়েছে, আর রিং হলে এখানেই ব্যাগের মধ্যে কোথাও আছে।"

মেঘা বলল-- 'হাসি ঠাট্টা গল্পের মধ্যে একি বিপত্তি রে বাবা।'

শ্রী বেশ সিরিয়াস মুখ করে নিজের সেল ফোন থেকে টুপুর-এর ফোনে call করল। টুপুর-এর ততক্ষণে panic attack শুরু হয়ে গিয়েছে. নিজের মনেই বলছে সর্বহারা এক চাহনি নিয়ে—"গেল, আমার এখন কি হবে ? ওই মোবাইলে আমার সর্বস্ব contacts আছে। মোবাইল ক্যামেরায় কত সুন্দর মুহূর্তগুলি ধরে রাখা আছে। ইশ, আমার হাতেই ছিল, কি করে যে পড়ে গেল বল্ তো?" এরই মধ্যে শ্রী লাফিয়ে উঠল, — "বাজছে, সে বাজছে।" সবাই সমস্বরে বলে উঠল—'বাজছে'? মেঘা বলল—'দ্যাখ যে নিয়েছে, সে ধরে কি না?" সকলের মনে ফোনটা ফিরে পাওয়ার একটা আশা জেগে উঠল। বাকী বন্ধুরা বলাবলি শুরু করল-"ফোনটা ধরলে ফিরে পাওয়ার আশা আছে, আর.... না ধরলে নেই।"

হঠাৎ একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে উঠল অপর দিক থেকে।

"হ্যালো। কে ?" সঙ্গে সঙ্গে শ্রী বলে উঠল— হ্যাঁ, দাদা ও "আমি। ফোনটা আপনার কাছে আছে তো? আপনি কোথায় আছেন? মানে, এটা আমার বন্ধুর ফোন, হারিয়ে গেছে।" হারিয়ে যাওয়া ফোন কথা বলে উঠেছে জেনেই শ্রীর আর কথা থামছে না। বাকীরাও ওর উত্তেজিত conversation শুনছে। আবার সেই ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল — "হ্যাঁ, ফোনটা আমি পেয়েছি। কিন্তু —— আপনার বন্ধুকে চিনব কি ভাবে ? ওনার নাম কি ?" টুপুরের দিকে তাকিয়ে শ্রী অবলীলায় বলে গেল—"লাল জামা, চোখে চশমা, আর নাম — টুপুর।" চোখের ইশারায় টুপুরকে আশ্বস্ত করে, ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে বলল— "আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন দাদা— আমরা যাচ্ছি।"

অচেনা ভদ্রলোকের গলা ভাসা-ভাসা শোনা গেল—"কসবা ডিপো।" ওরা তখন ছিল ইস্টার্ন বাইপাসের "রুবির মোড়" ছাড়িয়ে একটা রেস্তোরায়। ফোন রেখে চার বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল— "কসবা পুলিস ডিপো? কোনটা রে ?" বৃষ্টি আন্দাজে বলল—"আরে- – মনে হচ্ছে 'রুবির মোড়ে' পুলিস চেকিং এর একটা নতুন বিল্ডিং হয়েছে না, ওটাই হবে।" লোকটা ফোনটা পেয়ে পুলিশের সামনে ফেরত দিতে চায়।"

ঠিক হলো টুপুরের সঙ্গে বৃষ্টি যাবে। মেঘা বলল—"আমি আর শ্রী এখানেই wait করছি, খাবারের orderটা দিয়ে ফেলেছি তো। আর যদি কোন দরকার লাগে ফোন করিস।"

বৃষ্টি আর টুপুর ছুটল কসবা ডিপোর দিকে। যেতে যেতে আর একবার জায়গাটা confirm করার জন্য ফোন করল বৃষ্টি। "দাদা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন তো ? আমরা আসছি।" লোকটি বেশ উষ্ণ স্বরেই বললেন— "দিদি, ফোনটা পেয়ে যখন আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তখন আমরা ফোন নিয়ে পালাবো না।"

বৃষ্টি বলে উঠল—"না না, তা নয়। আসলে আমাদের একটু তাড়া আছে তো, তাই আপনাকে ফোন করলাম।" আর কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দুই বন্ধুতে ছুটল গন্তব্যস্থানের দিকে।

কিছুটা পরেই পুলিশ চেকিং ডিপোতে পৌছালো ওরা। গিয়েই দেখল, কয়েকজন লম্বা-চওড়া চেহারার পুলিশ সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে walky talky নিয়ে দু-চারটে গাড়ি, বাইক অটো চালককে ধরেছে, traffic আইন অমান্যের জন্য।

টুপুর অনেক আশা নিয়ে একজন অফিসারকে বলল, "দাদা, এখানে একজন কেউ মোবাইল ফোন ফেরত দিতে এসেছে ? আমার ফোনটা হারিয়ে গেছে, একজন খুঁজে পেয়ে আমাদের এখানে আসতে বলেছেন।" পুলিশ অফিসারটি শুনে বললেন —"কোথায় হারিয়েছে ?" আন্দাজে টুপুর বলল, 'সামনে হাফ কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও। কখন হাত থেকে পড়ে গেছে জানি না।" অফিসারটি এবার বেশ confident স্বরে বললেন, "ম্যাডাম, ফোন যখন ধরেছে, তখন ফেরত দেবেই। আর যদি না দেয়, এখুনি সামনে থানায় ডায়েরী করুন, তারপর আমরা দেখছি।"

থানা শুনে টুপুর আর বৃষ্টির মুখ দেখে পুলিশ সার্জেন্টটির মনে হয় একটু করুণা হল। আবার দৃঢ় স্বরে বলে উঠলেন--"কোন চিন্তা করবেন না, ম্যাডাম, আপনার ফোন এই এলাকার বাইরে কি করে যায়, আমি দেখছি।" এত টেনসনের মধ্যেও বৃষ্টি আর টুপুর হেসে ফেলল।

এই সময় বৃষ্টির হঠাৎ চোখে পড়ল গোবেচারা মত দেখতে একটি লোক কানে মোবাইল ফোন নিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, আর কি বা কাকে যেন খুঁজছে। ব্যস— সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বলে উঠল, "টুপুর, ওই দ্যাখ, লোকটা মনে হয় তোকেই খুঁজছে। দ্যাখ এই দিকেই আসছে। লোকটি সত্যিই যখন টুপুরদের দিকে এগিয়ে আসে, টুপুর সোজাসুজি তার সামনে গিয়ে বলল— "দাদা আমার ফোনটা দিন, আপনিই তো পেয়েছেন ? আমাকেই তো খুঁজছেন ?" গোবেচারা লোকটি হক্‌চকিয়ে গিয়ে বলে উঠল— "না না এটা আমার। আমি কোন phone পাইনি। একটা রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না বলে এই দিকে এসেছিলাম। যাক্ বাবা।" বলে লোকটা সোজা উল্টো দিকে দৌড় দিল।

বেশ হতাশ হয়ে টুপুর বলল— "লোকটা কি আমাদের সঙ্গে মস্করা করছে রে ? অনেক্ষন তো দাঁড়িয়ে আছি, আর একবার ফোন করবি ?" বৃষ্টি, টুপুরের নাম্বার ডায়াল করতেই আবার সেই গলায় স্বর ভেসে উঠল— "ম্যাডাম আপনারা কোথায় ? আমরা তো দাঁড়িয়ে আছি।" বৃষ্টি বুঝল কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। সামনের পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এসে বলল— "দেখি ম্যাডাম, আমি কথা বলছি।" বৃষ্টি কিছু বোঝার আগেই অফিসারটি বৃষ্টির ফোনটি নিয়ে কথা বলতে বলতে সোজা রাস্তা পার হয়ে অফিসারটি একটি সাইড লেন-এর দিকে পাড়ি দিল। বৃষ্টি টুপুরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল — " এই রে — একটা ফোন গেছিলো, এবার তো দুটোই চলে গেল।" টুপুর বলল—"তাইতো!

ভদ্রলোক তোর ফোনটি নিয়ে কোথায় গেলেন ? চল তো আমরাও যাই।" পাশ থেকে একজন civic volunteer বৃষ্টিদের কথোপকথন শুনছিল। সে নিজেই এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা এই অটো টায় বসুন না, স্যার এখুনি আসবেন ফোন নিয়ে।" বৃষ্টি বলল--"না না আমরাও যাচ্ছি।"

পুলিশ সার্জেন্ট যেদিক গেছিলেন, বৃষ্টিরাও সেই দিকে ছুটল। একটু এগিয়েই চোখে পড়ল সেই পুলিশ সার্জেন্ট একটি বাস ডিপোর সামনে দুটি মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

টুপুর আর বৃষ্টি সেখানে পৌছানোর পরেই, তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক বলে উঠলেন--"ম্যাডাম, এই নিন আপনার ফোন। আমরা সরকারী চাকরী করি দূষণ দপ্তরে। আপনার ফোনটা আরামবাগ এর দোকানের সামনের ফুটপাতে পড়ে থাকতে দেখে একটি ছেলে নিতে যাচ্ছিল। আমিও সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পেরে তাকে বলি--"এটা তো তোমার নয়, যার ফোন তাকে ফেরত দেওয়া উচিত।" বলে ফোনটা আমার কাছে রাখি। ভেবেছিলাম কেউ ফোন না করলে পুলিশের কাছে জমা দেব। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা ফোন করলেন।"

টুপুর ফোন ফিরে পেয়ে একটা নিশ্চিন্তের হাসি দিয়ে লোকটি ও পুলিশ অফিসারটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল।

আজও এইসমাজে কিছু নির্লোভ ও পরোপকারী মানুষ আছে, এই অনুভূতি নিয়ে দুই বন্ধু রেস্তোরায় ফিরে গেল এবং আধ ঠাণ্ডা স্যুপ নিয়ে অপেক্ষমান দুই বন্ধুর সাথে যোগ দিল।

"পঞ্চব্রত"

অধ্যাপিকা অনুরাধা সাধুখাঁ
দর্শন বিভাগ

জৈন দর্শন একাধারে ধর্ম ও দর্শন। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বর্দ্ধমান জ্ঞাতৃপুত্র। আনুমানিক ৫৯৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বৈশালী নগরে জ্ঞাতৃবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর বড় ভাই নন্দী বর্দ্ধনের অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ১৩ বছর আত্মনিগ্রহ ও সাধনাবলে তিনি 'কৈবল্য' লাভ করে 'জিন' নামে পরিচিত হন।

'জিন' শব্দ থেকেই 'জৈন' শব্দটি এসেছে। জিন শব্দের অর্থ হল জয় করা। যিনি সাধনার দ্বারা ষড়রিপু জয় করেছেন তিনিই জিন। জিন তীর্থঙ্কর নামেও অভিহিত হলেন। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ হল 'ঘাট'। যার সাহায্যে নদী থেকে ঘাটে বা তীরে ওঠা যায় তাকে তীর্থ বলা হয়। সংসার সমুদ্র থেকে উর্ত্তীণ হবার রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন বলে জিন-দের তীর্থঙ্করও বলা হয়। বিভিন্ন তীর্থঙ্করদের উপলব্ধ সত্যকে জৈন ধর্মে পরম ও চরম সত্য বলে গৃহীত হয়। জৈন ধর্মে ২৪ জন তীর্থঙ্করের কথা জানা যায়। ঋষভদেব হলেন প্রথম এবং মহাবীর হলেন সর্বশেষ তীর্থঙ্কর।

পার্শ্বনাথের উপদেশই জৈন ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি। বর্দ্ধমান তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উপদেশ মার্জিত করে নিজের শিষ্যদের সংঘবদ্ধ করেন। তাঁর সঙ্ঘে নারী-পুরুষ, গৃহী-সন্ন্যাসী সকলের স্থান ছিল। অনেকেরই বিশ্বাস যে, পার্শ্বনাথের প্রচারিত তত্ত্বগুলিকে সুবিন্যস্ত করে মহাবীর একটি যুক্তিপূর্ণ দর্শনমত সৃষ্টি করেন।

জৈন দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। জৈনমতে, তীর্থঙ্করগণই ঈশ্বর তুল্য ও পূজনীয়। এক সময়ে সংসারে আবদ্ধ তীর্থঙ্করগণই সাধনার দ্বারা মুক্ত হয়ে সর্বজ্ঞ, অপার আনন্দময় এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হয়ে ওঠেন। জৈনমতে, যে কোন জীব তার নিজ সাধনার বলে তীর্থঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। পার্শ্বনাথ তাঁর শিষ্যদের চারটি বিষয়ে সংযম সাধনার উপদেশ দিতেন। তা হল— হিংসা করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না, কোন কিছুতে আসক্ত হবে না। মহাবীর এই চারটি সংযমের সাথে আরও একটি জুড়ে দিলেন। সেটি হল — ইন্দ্রিয়কে জয় করতে হবে।

জৈন মতে, মুক্তির পথ খুবই দুর্গম। এরজন্য প্রয়োজন কঠোর কৃচ্ছতা সাধনের। সম্পূর্ণভাবে ভোগবাসনা জয় না করতে পারলে মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। জৈন

মতে, কেবলমাত্র মঠবাসী সন্নাসীগণই কঠোর কৃচ্ছতা সাধন করতে পারেন। ইন্দ্রিয়কে জয় করার জন্য প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির পর প্রয়োজন ত্রিরত্নের। সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যকচারিত্র হল ত্রিরত্ন। জৈন ধর্মে, সম্যক চারিত্রলাভের পর মঠবাসী সন্ন্যাসীদের পঞ্চমহাব্রত কঠোর ভাবে পালনের নির্দেশ আছে। পঞ্চমহাব্রত হল—

'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মাচর্য্যাপরিগ্রহাঃ'— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি ব্রতকে 'পঞ্চমহাব্রত' বলা হয়।

(ক) **অহিংসা ঃ** পঞ্চমহাব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হল অহিংসা। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' কায়-মন-বাক্যে কোন জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা না করা, ক্ষতির কথা না বলা হল অহিংসা ব্রতের মূলকথা। কেবলমাত্র ক্ষতি না করা নয়, সর্বজীবে ত্রস ও স্থাবর এর প্রতি প্রেম বিতরণ এবং হিতকর কর্মানুষ্ঠান করাও অহিংসা ব্রতেরই অঙ্গ। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের খুব কঠোরভাবে অহিংসা ব্রত পালন করতে হয়।

(খ) **সত্য ঃ** সত্যব্রত হল অহিংসাব্রতেরই অংশ। সত্যকথন, হিতকথন ও প্রিয়কথন হল সত্যব্রত। সত্যকে কঠোরভাবে পালন করার জন্য সন্নাসীদের নিন্দাসূচক, অহিতকর ও অপ্রিয় চিন্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত থাকার নির্দেশ দেওয়া আছে।

(গ) **অস্তেয় ঃ** কৌশলে বা কোনভাবে অপরের সম্পদ গ্রহণ না করাই হল অস্তেয়। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী কেবল সেইটুকুই গ্রহণ করবেন যা গৃহী আনন্দে দান করবেন।

(ঘ) **ব্রহ্মচর্য ঃ** জৈন নীতিশাস্ত্রে 'ব্রহ্মচর্য' বলতে কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে কামদমনকেই বোঝানো হয়েছে। শ্রমণদের জন্য অন্তরে-বাইরে, মনে-দেহে পরিপূর্ণভাবে সংযম পালন করার নির্দেশ আছে।

(ঙ) **অপরিগ্রহ ঃ** অপরিগ্রহ ব্রত হল, প্রয়োজনের বাইরে কোন সম্পদ সঞ্চয় না করা। উদ্বৃত্ত সম্পদের সবটুকু দরিদ্রদের খাদ্য-বস্ত্র বিতরণে ব্যয় করার নির্দেশ আছে।

মঠবাসী শ্রমণদের কঠোরভাবে অহিংস হবার জন্য জৈননীতিশাস্ত্রে পঞ্চমহাব্রতের সঙ্গে ত্রিগুপ্তি ও পঞ্চমসিতির বা সহকারী নিয়মেরও উল্লেখ আছে।

জৈন মতে, জীব নিজেই তার বন্ধনের কারণ। এবং অনন্তশক্তি সম্পন্ন জীব নিজে নিজেকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। তবে, তার মুক্তির পথ অতি দুর্গম। জৈন মতে কেবলমাত্র মঠবাসী সন্ন্যাসীগণই সেই দুর্গমপথ অতিক্রম করতে পারেন কঠোর কৃচ্ছ্রত সাধনের মাধ্যমে এবং বন্ধনরূপ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারেন পঞ্চমহাব্রত পালনের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। দর্শন—দিগদর্শন—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

২। ভারতীয় দর্শন—জগদীশ্বর সান্যাল

৩। সাম্মানিক নীতিবিদ্যা—সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

৪। ভারতীয় দর্শন—প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল।

পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। —স্বামী বিবেকানন্দ

মুক্তি

নম্রতা মন্ডল

দ্বিতীয় বর্ষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ)

সেদিন, সকাল থেকেই চাঁদের হাট বসেছে দাস বাড়িতে আর হবে নাই বা কেন? সেদিন যে দাস বাড়ির ছোটো মেয়ে উমার বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হবেন আজ দাসবাবু। সেই ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকতে চান সবাই। বলা হয় আধুনিকতার ছোঁয়া দাস বাড়ির আগের বাড়ি পর্যন্ত এসেই থেকে গেছে, দাস বাড়িতে এসে আর পৌঁছাতে পারেনি। যদি পৌঁছাতো তবে আজ উমার জীবনে এমন দিন আসত না। সদ্য স্কুল পেরিয়ে কলেজের দিকে পা বাড়িয়েছিল সে, চোখে তাঁর হাজার স্বপ্ন। হয়তো সে ভুলে গেছিলো যে (মেয়ে মানুষের স্বপ্ন দেখা মানা) যদিও তাঁর মাকে দেখে বোঝা উচিৎ ছিল.....। তিন তিনটে ছেলের পর যখন উমা ঘরে এলো দাস গিন্নী ভাবলো এবারে সে মেয়েকে মনের মত করে মানুষ করবে। সে নিজে যা সময়কালে শিখতে পারেনি তা তিনি মেয়ের মাধ্যমে শিখবেন। দাসবাবু স্পষ্ট কথা বলে দিলেন দাস গিন্নিকে-- "দেখ মেয়ে নিয়ে অত আদিখ্যেতা দেখানোর কোনো দরকার নেই যদি ছেলে হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করতো তবে হয়ত ভেবে দেখতুম।' সেইদিনই দাসগিন্নী উমার ভাগ্যখানা নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন। লোকচক্ষুর ভয়ে বা মানসম্মানের দায়ে ছোটো মেয়েকে কোলে নেন দাসবাবু নয়তো এখন কালো মেয়েকে কোলে নিতে বয়েই গেছে তাঁর। দাসবাবুর কালো গায়ের রংটা নয়নগোচর হলেও মেয়ের টানা টানা দুটো সুন্দর চোখ নয়নগোচর হল না। আর তার তিন দাদা হয়েছে বাবারই মতো, উমাকে তারা মোটে পছন্দ করে না, আসলে সঙ্গদোষ বলে একটা ব্যাপার আছে তো।

ছোটো থেকেই সঙ্গীহীনা উমার। মায়ের আঁচল ধরে হাটতে হাটতে কবে যে মেয়ে খানিক বড়ো হয়ে গেল তা বুঝতেই পারল না দাসগিন্নী। দাসবাবুর পায়ে-হাতে ধরে একটা গানের স্কুলে ভর্তি করতে পেরেছিল উমাকে। এই একটি স্বপ্নই পূরণ হল দাসগিন্নির। সকালে উঠে যখন ছোট মেয়ে রেওয়াজ করত তখন মা তার সারাদিনের কাজের রসদ জোগাত আর বাবার কাছে ছিল তা বিরক্তির কারণ। সত্যিই খুব কপাল করে জন্মেছিল উমা। ছোটোবেলা থেকে লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না। উমা সাথে সাথে খেলাধূলায়ও ছিল দরুণ পটু। সকলের কাছে প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেও বাবা ও তিন দাদার ভালোবাসা ও স্নেহ থেকে চিরকালই বঞ্চিত সে। বাড়িতে তিন দাদার জন্মদিন ধূমধাম করে পলন করা হলেও কোনদিনই উমার জন্মদিন নিয়ে কারোর বিশেষ মাতামাতি ছিলো না। উমার কোনোদিন কোন আপশোস

বা কোনো প্রশ্নও ছিলো না। তা নিয়ে ভগবান হয়ত মেয়ে হিসেবে পাঠাবেন বলেই অসীম সহ্য ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছিলেন উমাকে। উমা যেন সব দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ সব প্রশ্নের উত্তর পেত গানের মধ্যে। যা ছিল তার ছায়ার সঙ্গী।

কবে যে উমা বাবার চোখে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠল তা উমা কখনই টের পেল না। প্রমথবার উমা অনুভব করল যে উমার জীবনের কোনো একটি বিষয়ে বাবা খুব উদ্যোগী। সেদিন ছিল কলেজ ভর্তির Counselling তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছিল উমা, কারণ তাকে যে শাড়ি-গয়না পরে পাত্রপক্ষের সামনে বসতে হবে। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পর নতুন গয়না-শাড়ি পরিয়ে দিয়ে তৈরী করে দিল মা। কলেজ শুরু হতে এখনও বেশ কয়েকদিন দেরী আছে। পাত্রপক্ষের সামনে উমাকে এমন কিছু প্রশ্নোপত্রের সম্মুখীন করা হল যে উমার মনে হল এর থেকে উচ্চমাধ্যমিকে সব থেকে কঠিন প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া তার কাছে অনেক সহজ ছিল। বাবাকে সেদিন অনেকবারই শুনতে হল "সবই ঠিক আছে দাসবাবু মেয়ে গান জানে, ঘরের কাজ জানে, তবে গায়ের রঙটা বেজায় চাপা আসলে একটা ছেলের বউ করব কিনা— "। উমা তখন মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে, দুজনেই নিঃশব্দে। তবে কিছু করার নেই, বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাধ্য কারো নেই। পাত্রপক্ষের বাড়ির লোক জানালো যে তারা কিছুদিন পর ফোন করে জানাবে, আর একথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল "বিয়ের পরে গান বাজনা-টাজনা ওসব চলবে না।" উমার মাথায় সেদিন গোটা আকাশটাই ভেঙ্গে পড়েছিল। উমা তাও সাহস করে কিছু বলার চেষ্টা করেছিল যে কলেজটা অন্তত শেষ করার পর যেন তার বিয়ে দেওয়া হয়। উত্তরে দাসবাবু বলেছিল-- 'মেয়ে যে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে সেটাই কি যথেষ্ঠ নয়।' কিছুদিন বাদে ছেলের বাড়ি থেকে উত্তর এলো তাঁরা রাজি এবং তাঁরা এও বুঝিয়ে দিল যে তারা নিম্নবংশীয় কালো মেয়েকে উদ্ধার করল। আসলে তারা যে উচ্চবংশীয়। ইতিমধ্যে উমার কলেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। উমার মা ভালেভাবেই বুঝতে পেরেছিলো যে গানের সাথে সাথে লেখাপড়াটাও এবার বুঝি মেয়ের বন্ধ হবে। যথারীতি বিয়ের দিনটিও পাকা হল, পণ বাবদ বেশ কিছু ধার্য করা হল দাসবাবুর ওপর। উমা সেই সময় প্রতিবাদ করতে চাইলেও কোন উপায় ছিল না কারণ বাবা যে বলেছিল এবার মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন আর যদি বিয়ে দিতে পারেন তবে মেয়ে জন্ম দেবার পাপস্খলন করবেন। যথারীতি খুব অল্পদিনের মধ্যেই বিয়ের সমস্ত কিছু আয়োজিত হল। বিয়ের আগের দিন শেষবারের মত গান ধরল উমা আর শেষবারের মতই সেটিকে সহ্য করল তার বাবা ও দাদারা। তবে উমা একটা অনুরোধ করেছিল মায়ের কাছে যে, সে বিদায়বেলায় কণকাঞ্জলি দিয়ে বলবে না "মা, আজ তোমার সব ঋণ শোধ করলাম।' মেয়ের বিদায়বেলায় এই অনুরোধটি তার রাখা হয়েছিল। ঘর শূন্য করে মায়ের বুক খালি করে উমা গেল শ্বশুর বাড়ি। সেদিন শুধু একলাই কেঁদেছিল উমার মা কারণ তিনি উমার ভবিষ্যৎটা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে

পেরেছিলেন তাতে অবশ্য উমার বড় দাদা ব্যঙ্গ করে বলেছিল "যত সব আদিখ্যেতা' উমার শ্বশুর বাড়িতে কোন পূজোই বাদ ছিল না আর শ্বশুর বাড়ির মা-বৌয়েরা সপ্তাহে স্বামীর মঙ্গলকামনায় অর্ধেক দিনই প্রায় উপোস করে কাটিয়ে দেয় আর স্বামীরা মদ্যপ অবস্থায় রাত্রে বাড়ি ফিরে বৌয়ের গায়ে হাত তোলে। তাতেও শাশুড়ির সাফ কথা "ছেলেদের চরিত্র এমনই হয়"। অতপর অষ্টমঙ্গলার দিন বাবার বাড়িতে উমা জানতে পারল বাবা তার সাধের হরমনিয়ামখানা ফেরিওয়ালার কাছে কেজি দরে বিক্রী করে দিয়েছেন। উমা বুজতে পারল কেঁদে আর কিছু হওয়ার নয়। সেদিন আর কিছু খাওয়া হয়নি, এবার শ্বশুরবাড়ি ফিরল উমা। সে একথাও বেশ বুঝেছিল এভাবে তার পক্ষে কলেজ যাওয়া আর সম্ভব নয়। বন্ধ হল তার কলেজ যাওয়া। যত দিন গেল উমা যেন সংসারের বেড়া জালে জড়িয়ে পড়তে লাগল। সে অনুভব করল তাকে বাড়ির সমস্ত কাজ করানোর জন্যই এ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। আর তার স্বামীর ও যে তার ব্যতিক্রম নয় একথাও উমা বুজতে পেরেছিলো। এভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল, যদিও এসবের মধ্যে উমার একজন সঙ্গী হয়েছিল। সে ছিল বাড়ির কাজের মেয়ে। এই গোটা বাড়িতে একমাত্র সেই ছিল তার সাথে মানুষের মত ব্যবহার করত নয়তো উমার এ বাড়িতে থাকাটাই মুসকিল হয়ে যেত। তার নাম ছিল সরলা। সে উমাকে দিদিমুনি বলে ডাকত কারণ উমা যে তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে লেখাপড়া শেখাতো। সরলা ছিল উমার সকল অপমানের জীবন্ত সাক্ষী। উমাকে আজও শ্বশুর বাড়িতে প্রায়ই গায়ের রঙের জন্য কথা শুনতে হয়। কালের গতিতে উমা কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। সে নিয়েও তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি। শাশুড়ি জানিয়ে দিলেন পরবর্তী সন্তান যেন নাতিই হয়। তিনি নাকি নাতির মুখ দেখা ছাড়া নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারবেন না। অথচ ডাক্তার বলেছেন এক্ষেত্রে উমার কিছু শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে কিন্তু সেকথা বাড়ির অন্য কেউ বুঝলে হয়। ধীরে ধীরে সময় ঘনিয়ে এল। নার্সিংহোম থেকে হঠাৎ ফোন এল তখন শাশুড়ি মা ঠাকুর ঘরের দরজা দিয়েছেন বলেছেন নাতির খবর না পাওয়া পর্যন্ত ঘরের দরজা খুলবেন না। ফোনটা কিন্তু সরলাই ধরেছিল। খবর এল ছেলে হয়েছে কিন্তু উমা দেবী..... ।

অতঃপর বাড়ির বাইরে ফুলমালা দেওয়া শববাহী গাড়িটি দাড়িয়ে ছিল শেষ যাত্রার উদ্দেশ্যে। সেই সময় সরলা নীরবে গাছের দুটি গোলাপ ফুল নিয়ে এসে দিদিমুনির পায়ের কাছে দিয়ে বলল "ভালো থেকো দিদিমুনি, আজ তোমার মৃত্যু দিন না, আজ তোমার মুক্তির দিন।"

এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান

নিবেদিতা মণ্ডল
কলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

ব্রিটিশ শাসন কাল থেকেই হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ধর্মগত দিক থেকে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। তার প্রভাব আজও আমাদের সমাজে লক্ষ্যনীয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর একটি কবিতার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করেছিলেন যে —

'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান'

কিন্তু তা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি, আজও চলছে হিন্দু ও মুসলিমের দ্বন্দ্ব। আগুনের একটা ফুলকি যেমন এক নিমেষে সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে নিতে পারে। তেমনই একটি সত্য ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি।

আমার বাড়ি বাদুড়িয়া এলাকার একটি ছোটো গ্রামে। আমি যে ঘটনাটি বলতে চলেছি, সেটির সূত্রপাত হয়েছিল বাদুড়িয়া এলাকার আর একটি গ্রামে, যার নাম হল রুদ্রপুর। এই গ্রামে হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতির বাস। এই গ্রামেরই সপ্তম শ্রেণীতে পড়া এক হিন্দু বালক, যার নাম ছিল প্রিয়জিৎ বিশ্বাস আর তার বন্ধু যার বাড়ি ছিল একটু দূরে আড়বেলিয়া গ্রামে। সে ছিল মুসলিম বালক, যার নাম ছিল ইমরান ইসলাম। যাই হোক, এই দুজনকে নিয়ে ঘটনাটি ঘটে, একদিন তারা Tuition থেকে ফেরার পথে খুব মজা করছিলো মোবাইল ফোন নিয়ে। তারপর তারা মজা করতে করতে দুজন মিলেই Facebook-এ মুসলিম ধর্মের মস্‌জিদের ব্যাপারে বাজে কিছু লিখে ছবি Post করে দেয়। তারপর সেই লেখাটি সবার ফোনে যায়। মুসলিমরা এই লেখাটি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রথমে তারা খোঁজ খবর করে ইমরানকে প্রশ্ন করায় সে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং সে পুরো দোষটা প্রিয়জিৎ-এর ওপর দেয়। যেহেতু প্রিয়জিৎ হিন্দু ছিল তাই তারা আরও বেশি হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতি দেখে প্রিয়জিৎ তার বাবা-মায়ের কাছে পুরো ঘটনাটি বলে এবং তারা খুব ভয় পেয়ে যায়। যখন তারা দেখে যে, অবস্থা খুবই শোচনীয় তখন প্রিয়জিৎকে বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয় তার বাবা-মা। আমি যদিও জানিনা যে তাকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, তারপর কিছু মুসলিম লোকজন তাদের বাড়িতে যায় এবং গিয়ে তারা প্রিয়জিৎ-এর খোঁজ করে। তার বাবা মা কিছুতেই বলতে পারেনি কারণ তারা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। প্রিয়জিৎ-এর খবর না দেওয়ায় তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে এবং তাদের বাড়ি ভাঙচুর করতে থাকে। এরপর থেকেই শুরু হয় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। এই আক্রমণ শুরু হয় 6th

July 2017. এই আক্রমণ আমাদের মহকুমা বসিরহাটকে ঘিরেও ছড়িয়ে পড়ে। এই আক্রমণে যুক্ত ছিল আরও অনেক বাইরের মুসলিমরাও। ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে ছিল আক্রমণকরীদের সংখ্যা। তারা হিন্দুদের মন্দির ভাঙচুর করতে লাগে। এমনকি হিন্দু নারীদের ওপরও অত্যাচার শুরু করে তারা। এর ফলে আমাদের মানে মেয়েদের বাড়ির বাইরের বেরোনোই ছিল খুবই ভয়ের।

এই আক্রমণকে সামলাতে পুলিশ প্রাশাসন এগিয়ে এলে তারা পুলিশদের ওপরেও আক্রমণ করে এবং তাদের ওপর মারধরও কবে, এমনকি তারা পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়, যে দিন এই ঘটনাটি ঘটে সেদিন রাতের অবস্থা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। সেদিন প্রায় রাত 9.00 টার দিকে এত বোমের আওয়াজ হচ্ছিল যে কান পাতা যায় না। আমরা সেই রাতটা কাটিয়ে ছিলাম খুবই ভয়ে ভয়ে।

'তার পরদিন সকালে দেখা যায় রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা পুলিশ গাড়ির ভাঙা অংশ এবং রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কাঁচের টুকরো। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকে প্রায় দু সপ্তাহ ব্যাপী। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এতদিন ব্যাপী চলতে থাকায় আমরা তো বাড়ি থেকেই বের হতে পারতাম না, তার ওপর সব দোকানগুলি ছিল বন্ধ, এমনকি বাজারও বসতো না, আমরা হাটও করতে পারতাম না। যার ঘরে যেটুকু ছিল তাই দিয়েই চালিয়েছিলাম দিন গুলি খুবই কষ্টের মধ্যে। আমাদের পড়াশুনারও খুবই ক্ষতি হয়েছিল কারণ স্কুল-পাঠ বন্ধ ছিল প্রায় ২০ দিন।

এমনই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি পুলিশ প্রশাসন সামলাতে না পেরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চায়। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু বাহিনী পাঠায়। তারা ছিল প্রায় ১৫-২০ দিনের মতো। তারা থাকতো আমাদের হাইস্কুলে। যার নাম 'বাদুড়িয়া, এল. এম. এস হাইস্কুল'। তারা প্রতিদিন রাতে পাহাড়া দিত চারিদিকে মানে পুরো বাদুড়িয়া এলাকা ঘিরে। আমাদের রাত 8.00 পরে বাড়ির বাইরে বেরোনই নিষিদ্ধ ছিল। এভাবেই কাটলো কিছুদিন। তারপর আস্তে আস্তে চারিদিকে শান্ত বাতাস বইতে লাগল। পুলিশরা কিছুদিন পর প্রিয়জিৎকে থানায় নিয়ে যায়। তাকে কিছুদিন সেখানে রাখা হয়। এরপর কিছুদিন পর প্রিয়জিৎ নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে রক্ষা পেয়ে যায়। তারপর সে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যায়।

এখন সবই শান্ত। আমাদের এলাকা জুড়ে যে হিন্দু ও মুসলিমের দ্বন্দ্বের চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই চাঞ্চল্যকর অবস্থা এখন আর নেই।

আমাদের প্রত্যেকের তাই সচেতন হওয়া আবশ্যিক, যাতে ভবিষ্যতে এমন সামান্য ঘটনা এইরকম তাণ্ডব সৃষ্টি করতে না পারে। এর জন্য চাই শিক্ষার প্রসার সমাজের সর্বস্তরে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে আরো বেশি ওয়াকিবহাল হতে হবে। শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার যা এই অন্ধকারকে দূর করতে পারবে।

"এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক"

সুপ্রিয়া মন্ডল

দ্বিতীয় বর্ষ (সাম্মানিক), দর্শন

ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনাগুলির মধ্যে ১৯০৫ খ্রিঃ সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রক্ষেপে সমগ্র বাংলাদেশ মুসলিম শাসনের করায়ত্ব হয়ে পড়ায় তাদের আগ্রাসী মনোভাবের শিকার হয় সমগ্র হিন্দু সমাজ। আমি হিন্দু সমাজের এই দুরব্যবস্থার একটি করুণ্যময় সজীব চিত্র অঙ্কন করতে চলেছি যা আমার হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

বাংলাদেশ মুসলিম জনজাতির রাজত্ব তাই সেখানে হিন্দুদের বসবাস করা দুস্কর হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনা প্রায় ৪০ বছর আগেকার, তখন বাংলাদেশে হিন্দুজাতির ওপর মুসলমানদের অত্যাচার প্রবল হয়ে ওঠে। হিন্দুদের বসতবাড়িগুলি আগুন লাগিয়ে দেওয়া, মহিলাদের নির্যাতন করা, কোন অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেই কণ্ঠরোধ করে দেওয়া— এটাই ছিল তখনকার মুসলিমদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকান্ড। এই নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দলে দলে মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসতে শুরু করে। কিন্তু বাংলাদেশের সীমারেখা পার হয়ে আসার সময় বহু মানুষ মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছিল। সেই সময়ই একটা পরিবার ভারতে এসেছিল যে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছিল ছয়জন, এই ছয়জনের মধ্যে ছিল এক স্নেহময়ী মা, বাবা, দুই ছেলে, একটি মেয়ে এবং আরও একটি সদ্যজাত শিশু কন্যা। বাংলাদেশের সীমারেখা পার করে ভারতে আসতে গেলে নদী পার হয়ে আসতে হয় এবং আরও অনেক বাধাবিঘ্নতো আছেই। এই পরিবার যখন ভারতের উদ্দেশ্যে আসছিল তখন তাদের সঙ্গে ছিল আরও অনেক বাংলাদেশী মানুষ, যারা মুসলিমদের চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে, নির্বিঘ্নে এই সীমারেখা পার করতে চাইছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল সেই সদ্যজাত শিশু কন্যা যে না খেতে পেয়ে মাঝে মাঝেই চিৎকার করে উঠছিল, যা ছিল এই মানুষদের কাছে ত্রাসের। তাই সকলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সদ্যজাত শিশু কন্যাকে ফেলে দেবে, কিন্তু তার মা কিছুতেই রাজী হয় না। এইমত অবস্থায় দলের অন্যান্য সমস্ত লোকেরা ঐ পরিবারকে ফেলে রেখে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসে। ঐ পরিবার যে আসেনি তা নয়, এসেছিল কিন্তু যতদিনে ভারতে এসে পৌছেছে বহু বাধাবিঘ্ন ঠেলে তখন তাদের অবস্থা শোচনীয়, না আছে তাদের কাছে মাথা গোঁজার জন্য একটুকরো জমি, না আছে ক্ষুধা মেটাবার জন্য এককনা খাবার। তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব। বলা বাহুল্য সেইসময় ভারতে এমন পরিবার খুব কমই ছিল যাদের বাড়িতে কাজের লোকের প্রয়োজন হত। কিন্তু তবুও মা, বাবা দুজনেই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কাজের খোঁজ করে। অবশেষে দুজনেই পৃথক পৃথক বাড়িতে কাজ খুঁজে পায়। সারাদিন কাজ করার পর মা পেত একবেলার মত

খাবার যেটা সে নিয়ে আসত এবং সকলে মিলে ভাগ করে খেত এবং বাবা কাজের বিনিময়ে পেত সামান্য কিছু পয়সা যা দিয়ে তারা কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তার পাশে সরকারি জায়গায় ছোট একটা কুঁড়েঘর তৈরী করে, যা কিনা পাতা ও খড় দিয়ে ঘেরা ছিল। কিন্তু এই শিশু কন্যা সে তার ক্ষুদা নিবৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছিল না কারণসারাদিন সে মাকেই কাছে পায় না। বোন খুব কাঁদলে তার ছোট দিদি তাকে নিয়ে যেত মায়ের কাছে, কিন্তু সে বাড়িতে তাদের সঙ্গে মাকে দেখা করতে দেওয়া হত না, তবুও মেয়ের কান্না শুনে মা ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতো এবং মালিককে অনেক অনুরোধ করত মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়ার জন্য। শিশুটাকে সামান্য খাইয়ে আবার তাকে কাজে মনোযোগ দিতে হত। কিন্তু এই সামান্য খাবার স্বল্প সময়ের জন্য তারপর আবার খিদে ও আবার কান্না, তখন তার দিদি তাদের আশেপাশে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভাতের ফ্যান চেয়ে নিয়ে আসত, তাই খেয়েই বড়ো হয়েছিল সেই মেয়ে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা মেয়েটি যখন শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উন্নীত হয় তখন সে তার হাত বাড়িয়ে দেয় পোড় খাওয়া সমাজের উদ্‌বাস্তু ও অসহায় মানুষের প্রতি। সে অসহায় মানুষের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে কারণ সেও এই অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। বলাবাহুল্য যে, সেই শিশু কন্যা হয়ে ওঠে এক বিদূষী নারী এবং সমাজের আরও কিছু মেয়েকে উদ্বুদ্ধ করে একটা সংগঠন গড়ে তোলে। যে সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল সমাজের উদ্‌বাস্তু ও অসহায়ের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আর এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিল জীবন মৃত্যুর দ্বন্দে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশ থেকে আগত সেই কন্যা। তার সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের প্রতি মুগ্ধ হয়ে একদিন সে সম্মানিত হল, প্রতিষ্ঠিত হল একজন প্রখ্যাত সমাজসেবিকা হিসাবে। তার এই কর্মকান্ডে পিতা মাতা আপ্লুত হয়। সেই অনাহত, ক্লিষ্ট মেয়েটি ক্রমে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্টিত হয় স্বনামধন্য এক ভারতীয় নারীতে। সমগ্র সমাজের কাছে সেই মেয়েটি হঠাৎই পরিনত হয় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে ; যার জ্যোতিতে সমগ্র সমাজও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সেই মেয়েটির নাম না হয় আমাদের কাছে অজানাই থাক।

সব পথ দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। — শ্রীরামকৃষ্ণ

বিচ্ছেদ

অনুরিমা সাহা

সহকারী অধ্যাপিকা (বাংলা বিভাগ)

অনিতা ওর মাকে ভালবাসে। খুব ভালবাসে। সবাই নিজের মাকে যতটা ভালবাসে হয়ত তার চেয়েও বেশী। ছোটবেলা থেকেই বাবার চেয়ে মায়ের প্রতিই ওর টানটা বেশী। বাবা চাকরী নিয়ে ব্যস্ত। অনিতাকে সঙ্গ দেয় তবে তা রুটিনমাফিক। প্রতিদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফেরার সময় মনে করে অনিতার জন্য পছন্দের মিষ্টি আনে। অফিস থেকে ফিরে অনিতার সঙ্গে বসে কিছু সময় টি. ভি. দেখে। অনিতার পড়াশুনার বিষয়ে খোঁজ নেয়। ওর অঙ্কের স্যার বদলাতে হবে কিনা, নতুন কোনো বিষয়ের মাস্টার লাগবে কিনা খোঁজ নেয়। অফিসের বন্ধুবান্ধব মারফৎ নতুন কোচিং ক্লাসের খোঁজও এনে দেয়। অনিতার পছন্দের ম্যাগাজিন কিনে আনতে কোনো মাসে ওর বাবার ভুল হয় না। তবু অনিতা মা ন্যাওটা। অনিতার বড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসই ওর বাবা ওকে দিতে ভোলেনি। আবার একথাও ঠিক প্রয়োজনের বাইরের কোন জিনিস ভুল করেও কখনো কিনে আনে নি। অনিতার কাছে তার বাবা একজন 'ভালো বাবা', ব্যস। আর অনিতার মা ওর কাছে মস্ত কিছু। একজন ভালো মা, ভালো বন্ধু, যত্নশীলা, দরদী আশ্রয়স্থল।

অথচ অনিতার বাবা যেমন বাবার দায়িত্বটুকুর বাইরে কখনো কিছু করেনি, অনিতার মাও মায়ের দায়িত্বের বাইরে তেমন কিছুই করেনি। তবু অনিতা বাবার চেয়ে মাকে বেশী ভালবাসে। হয়ত বাবার চেয়ে মাকে বেশি সময় কাছে পেয়েছে ব'লে এমনটা হয়েছে। হয়ত সর্বক্ষণ মা তাকে আগলে রেখেছে, যত্ন করেছে বলে মা এর ওপর নির্ভরতা এত বেশি। মাকে অনুকরণ করতে করতেই ওর বড় হওয়া।

অনিতার মা ঘরোয়া, সুশ্রী, স্লিম। অনূর্ধা বাইশ বছরেই কাগজের বিজ্ঞাপন যোগে বিয়ে হয়ে যায়। পড়াশুনা আর এগোয়নি। সংসারের পথেই এগোতে হয়েছিল। স্বামী আর শ্বশুর নিয়ে অনিতার মা তার ছোট সংসার নিজের মতো করে গুছিয়েছিল। বিয়ের বছর দুয়েকের মাথায় ছোট সংসারে এসেছিল ছোট্ট অনিতা। আর ছোটবেলা থেকেই মায়ের নরম সুতির কাপড়ের কোলটা ওর বেশি পছন্দ ছিল বাবা আর দাদুর কোলের চেয়ে। মায়ের মুখের সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর গল্পগুলো বেশি ভাল লাগত দাদুর মুখে শোনা পঞ্চতন্ত্রের গল্পের থেকে। এভাবেই একটু একটু করে বাবা দাদুকে সরিয়ে মায়ের জন্য অনিতার ভালবাসার জায়গাটা বড় হয়েছে। মাকে অনুকরণ করতে করতে অনিতা যেন মায়েরই একটা ছায়ারূপ পেয়েছে। দাদুর মতো আত্মভোলা নয়, বাবার মতো অগোছালো নয়, মায়ের মতো কর্মপটুই

হতে চেয়েছে অনিতা সজ্ঞানে। সাংসারিক কাজকর্ম কখনোই তার মা তাকে হাতে ধরে শেখায়নি। মায়ের অনুকরণ করতে করতেই সে শিখে গিয়েছে জিনিসপত্র গোছাতে, সমান মাপে তরকারি কাটতে, চেপে চেপে ঘর মুছতে। আর কাজের মাসি চলে যাবার পর জামাকাপড় আরেকবার নিঙড়ে মা যেভাবে মেলে দেয় অনিতা সেটাও শিখে নিয়েছে। জামাকাপড়ের একদিক বেশী ঝুলিয়ে একদিক কম ঝুলিয়ে মেলতে হয়, এতে শুকায় তাড়াতাড়ি-- এসব মা না থাকলে অনিতা জানত কোথা থেকে ?

তবে এতকিছু জেনেও অনিতার কোনো লাভ হল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সংসারের চব্বিশ রকম কাজকে কী ভাবে খাপে খাপে পুরে ফেলতে হয় অনিতা তার মাকে দেখে এটা শিখেছিল। সারাদিনের কাজগুলোকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেরে ফেলে সন্ধেবেলা টিভি খুলে সোফায় গা এলানোতেই জীবনের চরম উপভোগ-- এটাই অনিতা জানত। কিন্তু সময়কে ভুলে গিয়ে কোনো কাজে ডুবে গিয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে উপভোগ করার ধারণা অনিতার ছিলনা। তাই বিবাহিত জীবনে শুরু থেকেই অনিতার সঙ্গে দিব্যেন্দুর মত বিরোধ ঘটতে লাগল।

দিব্যেন্দু স্বামী হিসাবে ভাল। মানুষ হিসাবেও মন্দ নয়। কর্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচেতা, কাজ পাগল। বড় কোম্পানীর ম্যানেজার। পয়সার অভাব নেই তবে অনিতার জন্য সময় খরচের অভাব ঘটে যায় কখনো কখনো। এটাকেই অনিতা দিব্যেন্দুর একমাত্র ত্রুটি বলে ভেবেছিল। পরে দেখল দিব্যেন্দু শুধুমাত্র কাজের চাপে সংসারের জন্য সময় পায় না তা নয়, সময়ে খাওয়া সময়ে শোওয়ার রীতিটাকেই সে সংসারে বিশ্বাস করে না। অনিতা এ নিয়ে নানা অভিযোগ করেছে কিন্তু দিব্যেন্দু বদলায়নি। উল্টে অনিতাকে বলে এতে লাভ কী হবে ? জীবনে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করব না সময়ের ইচ্ছা অনুযায়ী চলব ? অনিতা সদুত্তর দিতে পারে না কিন্তু তার সাজানো সংসারে তাল কাটতে থাকে। দুজনের জীবনের বিশ্বাসগুলো আলাদা। ভালবাসা দিয়ে এই অমিলটা সর্বদা ঢাকা পড়ে না। অনিতাকে খুশী করতে দিব্যেন্দু দুম করে একদিন অফিসে ছুটি নিয়ে নেয়। অনিতাকে সঙ্গে করে সিনেমা দেখে, রেষ্টুরেন্টে খায় আর বলে --'এবার খুশী তো ? আজ তোমায় সারাটা দিন দিলাম। কাল কিন্তু সারাদিনটা আমার নিজের জন্য বরাদ্দ।' অনিতা রাতের খাবার ফ্রিজে গোছাতে গোছাতে ভাবে কী লাভ হল ? তার মানে কাল খাওয়া শোওয়ার টাইমের ঠিক থাকবে না। আবার অনিয়ম শুরু। একদিন দিব্যেন্দু হঠাৎই একটা টিভি কিনে ফেলে। অনিতাকে খুশী করতে আরেকটা টিভির দরকার ছিল। দুজনের পছন্দের চ্যানেলে মিল হয় না। অনিতা বলে--'এতগুলো টাকা হুট করে খরচ করলে ?' দিব্যেন্দুর সরল

উত্তর 'ইনস্টলমেন্টে কেনার মত অবস্থা তো আমাদের নয় তাই একেবারেই পেমেন্ট করলাম সামনের গোটা মাস অলিম্পিক। তুমি সিরিয়াল ছেড়ে সেটা আমার সাথে দেখতে নাকি? অনিতা খুশী হয় অথচ ওর হিসেবে গরমিল হয়ে যায়। অনিতার মধ্যবিত্ত পরিবারে আয়, ব্যয়, আনন্দ, উপভোগ সবই ছিল নির্দ্দিষ্ট পরিমাপে। নিজেকে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হত। এখানে সে সবের বালাই নেই। শুধু খরচপাতি নয় সংসারের নিয়মগুলোও শিথিল। খিদে পেলে খাওয়া, ঘুম পেলে ঘুমানো, রাত জেগে সিনেমা দেখা, বই পড়া, কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা সবই ইচ্ছেমতো করা যায়— এটা কি উচ্ছৃঙ্খলতা না এটা স্বাধীনতা অনিতা বুঝতে পারে না।

বিয়ের পর এই প্রথম এক মাসের জন্য অনিতা মায়ের বাড়ি আসে। বাপের বাড়ি নয়, এই বাড়ি যেন অনিতার কাছে অনেক বেশী তার মায়ের বাড়ি। মায়ের যত্ন, মায়ের নিয়ম, মায়ের ছোঁয়া, মায়ের প্রভাবেই ঘিরে থাকা এই বাড়ি। মনে মনে অনিতা অনেক নালিশ জমিয়ে এনেছে। দিব্যেন্দুর উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের কথা বলে মায়ের কাছ থেকে জেনে নেবে কী ভাবে ওকে বদলানো যায়। প্রথম কয়েকদিন কেটে যায় দেখতে দেখতে। ফেলে যাওয়া মা, বাবা, দাদুর সংসারে ফিরে এসে অনিতার গল্প আর শেষ হয় না। কিন্তু মনের ভেতরে গোপনে একটা পরাধীনতার অনুভূতি কোথাও যেন অনিতাকে চেপে চেপে ধরে। দিব্যেন্দু তাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, অবাধ স্বাধীনতা। মা তাকে নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়েছে, সময়ের কাছে প্রবল পরাধীনতা। অনিতা এই সংসারেই বেড়ে উঠেছে মায়ের ছায়ারূপ হয়ে অথচ এখানে ফিরে এসেও সে শান্তি পায় না। দিব্যেন্দুর কাছে থাকতে থাকতে অনিতার মনে হয়েছিল যা জানি, যা শিখেছি সংসারের সঙ্গে তার মিল হচ্ছে না কেন ? মায়ের বাড়ি এসে অনিতার মনে হল যা অনুভব করেছি, যে ভাবে চাইছি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস সে ভাব ধরা দিচ্ছে না কেন?

অনিতার টিভি দেখার সময় তার মা ডাক দেয়—উঠে আয়, খাওয়ার সময় হয়েছে। অনিতা বলে— একটু পরে খাব মা। এখন সিনেমাটা পুরো ক্লাইমাক্সে। মা বিরক্ত হয়- খাওয়ার সময় খাবি না তো কখন খাবি? সিনেমা না দেখলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। উঠে আয়। অনিতা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে, অস্ফুটে বলে— দিব্যেন্দুর ওখানে এসবের ঝামেলা নেই। মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। এভাবেই মত বিরোধ শুরু হয়। খাওয়া, শোওয়া, টিভি দেখা, একটানা ফোনে কথা বলা সব বিষয় নিয়ে অনিতা আর মায়ের মধ্যে চাপান উতোর চলতে থাকে। দিব্যেন্দুর বিরুদ্ধে বয়ে আনা অভিযোগগুলো মিলিয়ে যায়, মায়ের বিরুদ্ধে অনিতার মনে একরাশ ক্ষোভ জমা হয়। বেলা গড়িয়ে একটা বাজলে মা ডাক দেয় অনিতাকে স্নানের জন্য। অনিতার খেয়াল থাকে না। ও তখন মেল চেক

করতে, উত্তর পাঠাতে ব্যস্ত। মা ঘরে এসে রুক্ষস্বরে বলে-- 'অনেকবার চানে যেতে বলেছি, কটা বাজে খেয়াল আছে? গীজারের গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বারবার গীজার চালাতে পয়সা লাগে না ?' অনিতা রাগ চেপে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায় মায়ের স্বর-- 'বিয়ের পর যত ধিঙ্গিপনা বেড়েছে। সংসারে থাকতে গেলে একটা নিয়ম মানতে হয়, না পারলে দিব্যেন্দুর কাছে গিয়েই থাকো।'

স্নান করতে করতে অনিতার দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ে। আজ সত্যি করে সে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করে। দিব্যেন্দুকে অনুভব করে। নিজের মত করে জীবনে বাঁচার মানে বুঝতে পারে। উচ্ছৃঙ্খলতা আর স্বাধীনতার বিভেদ বুজতে পারে। আর আজ ভালবাসার মায়ের ছায়া থেকে অনিতা সযত্নে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

সন্তোষের সমান ধন নেই, আর সহ্যের সমান গুণ নেই।
--- শ্রীমা সারদাদেবী

অরণ্যানী

সংঘমিত্রা মুখার্জী

সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

বৈদিক ঋষির প্রগাঢ় মনীষার প্রদীপ্ত পরিচয় মেলে বৈদিক মন্ত্রগুলিতে। বেদের মন্ত্রভাগে বহু দেবতার স্তব-স্তুতি করা হয়েছে। দেবতাদের অপার মহিমায় বিস্মিত ঋষি সসংভ্রমে তাঁদের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। সেই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে নানা প্রার্থনা, যা ঋষিমনের বিবিধ ভাব বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। সেকালে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের ছিল এক সুনিবিড় বন্ধন, ওতপ্রোত সম্পর্ক— তাই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে উপাসনা করতেন তাঁরা। প্রকৃতির অপরূপ রূপবৈচিত্র্য দর্শনে বৈদিক ঋষিরা মুগ্ধ ও বিহ্বল হতেন, একাধারে প্রকৃতির ভীষণ ও মধুর মূর্তি তাঁদের মনে স্বতঃই ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করত। তাই বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাদের দেবতারূপে কল্পনা করে, সেই সমস্ত ঐশী শক্তির উদ্দেশ্যে স্তুতি পাঠ এবং যজ্ঞ সম্পাদন করাই ঋগ্বেদের ধর্মের মূল ভিত্তি। উদীয়মান সূর্যের জ্যোতির্ময়তা, উষার বিমল কান্তি, মেঘের প্রবল গর্জনের সঙ্গে বারি বর্ষণ, বিশাল সিন্ধু নদ, বিস্তৃত মেদিনী, ঘন ঘোর অরণ্যানী প্রভৃতি সকলেরই অন্তরালে পৃথক পৃথক দৈবীশক্তি বিরাজমান বলেই বিশ্বাস করতেন বৈদিক মানবকূল।

নিসর্গ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম একটি বোধ ও স্বতঃউৎসারিত আনন্দ প্রতিফলিত হয় বৈদিক মন্ত্ররাজিতে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঋষি ঐরম্মদ দেবমুনি অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে 'অরণ্যানী' দেবীর স্তুতি করেছেন। অপূর্ব কাব্যরসে পরিপূর্ণ, ছয়টি মন্ত্র সমন্বিত এই ক্ষুদ্র সূক্তটিকে আধুনিক পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী গীতধর্মী সূক্ত (lyrical hymn) বলা যায়।

পাণিনির মতে, অরণ্যানী শব্দের অর্থ সুবিশাল অরণ্য 'হিমারণ্যয়োর্মহত্ত্বে' (পা ৪ / ১ /৪৯) নিরুক্তকার যাস্কের মতে (৯/২৯) অরণ্যানী হলেন অরণ্যের পত্নী। তিনি অরণ্য শব্দটির দুটি নির্বচন দিয়েছেন--'অপার্ণং গ্রামাদরমণং ভবতীতি বা' অর্থাৎ অরণ্য গ্রাম থেকে অনেক দূরে অপগত বা অবস্থিত, অথবা অরণ্য 'অরমণ' অর্থাৎ অসুখকর।

লোকালয় বা গ্রাম থেকে দূরে সুবিশাল অরণ্য বিস্তৃত। বৈদিক ঋষির কল্পনায় অরণ্যানী সম্পূর্ণ একা একা অনেক দূরে চলেছেন। তাই কবির ব্যাকুল প্রশ্ন 'হে অরণ্যানি, তুমি কেন গ্রামের কথা জানতে চাইছ না? এই একা চলায় তোমার কোন ভয় নেই ? (কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতীতঁ (১০.১৪৬.১) মানব সব সময় সঙঘবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে, একা থাকলে তাকে গ্রাস করে ভয় ও অস্বস্তি বোধ। তাই ঋষির এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। সুগভীর অরণ্য যেন সত্যিই এক অন্য জগৎ, সেখানে আছে অনেক পশু, পাখী, পতঙ্গ প্রভৃতি। পশুর সুতীব্র গর্জন, পাখীর কূজন, পতঙ্গের অবিশ্রান্ত ডাক-- সব

কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে অরণ্যে এক বিশেষ ধ্বনি বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ঝিল্লি অর্থাৎ ঝিঁঝিঁ পোকার অবিরাম ডাক শুনে অন্য কোন এক পতঙ্গ চিক্ চিক্ শব্দ করতে করতে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। এই রকম নানাবিধ ধ্বনি ও অনুধ্বনি শুনে ঋষির মনে হচ্ছে অরণ্যানী যেন আঘাটি বাদনরতা এক দেবী। তিনি তাঁর বীণায় শুদ্ধভাবে সপ্তসুর বাজাচ্ছেন বা গাইছেন। তাঁর পরিশীলিত সঙ্গীতসাধনা অরণ্যানীকে করে তুলেছে মহিমান্বিতা।

(বৃষরবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ

আঘাটিভিরিব ধারয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে (১০.১৪৬.২)

বিশাল অরণ্যে রয়েছে অজস্র গাছ-গাছালি, ছোট ছোট ঝোপ ও লতা। ঋষির মনে হচ্ছে যেন অরণ্যে গরু ও অন্যান্য পশুরা চরে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে। কাঠ, মধু প্রভৃতি আহরণ করার জন্য ছোট ছোট শকট নিয়ে অনেকেই সকালে অরণ্যে প্রবেশ করে, আবার সন্ধ্যা নামলে তারা মালপত্র নিয়ে অরণ্য থেকে নির্গত হয়। গহন অরণ্যের অন্ধকারে দৃষ্টি বিভ্রম হয়। আলো-আঁধারে কোথাও বা মনে হয় একটি বাড়ী যেন দাঁড়িয়ে আছে। অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় যখন কেউ তার হারিয়ে যাওয়া গরুকে ডাকে, যখন কেউ সশব্দে গাছ থেকে কাঠ কাটে। অরণ্যানী তার আশ্রিতদের প্রতি সদাই অনুকূল থাকেন। তিনি কখনই কাউকে আঘাত করেন না। হিংস্র বাঘ বা চোর ডাকাতরাই একমাত্র মানুষকে হত্যা করে। তাই হিংস্র প্রাণীদের সামনে পড়ে না গেলে যে কোন মানুষ বনের অনায়াসলভ্য সুমিষ্ট রসাল ফল খেয়ে যেমন খুশী তেমন ভাবে অরণ্যে থাকতে পারেন (স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নিপদ্যতে (১০.১৪৬.৫)।

অরণ্যের একটি নিজস্ব গন্ধও আছে। আঞ্জন গন্ধি সুরভিতে ভরপূর অরণ্য। অরণ্যের নানাবিধ গাছ বনস্পতি, ওষধি, গুল্ম যেমন আছে, তেমনি গন্ধবিশিষ্ট ফুলফলের গাছও আছে প্রচুর। তাই অরণ্যানীর সৌরভ অঞ্জন বা কস্তুরীর ন্যায়। কোন কৃষকের পরিশ্রম ছাড়াই কত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে অরণ্যে। এই বনভূমি পশুদের মাতৃস্বরূপা। এই অরণ্যের কোলেই তারা আজন্ম লালিত-পালিত তথা সযত্নে বর্ধিত। নানাবিধ খাদ্য সরবরাহ করে অরণ্যানী 'বহ্বন্না' মৃগমাতা অরণ্যানীকে সাদরে প্রণতি জানিয়ে ঋষি দেবমুনি তাঁর স্তব শেষ করেন-

'প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যা নিমশংসিষম্' (১০.১৪৬.৬)।

অণু কবিতা

ডঃ রোহিনী ধর্মপাল

অধ্যাপিকা, (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ)

হাইকু এক ধরণের জাপানী কবিতা, অণু-কবিতা বলা যায়। কলেবর নেহাতই ছোট। মাত্র তিনটি পংক্তি। তবে সেই তিনটি পংক্তির অক্ষর বিন্যাসের কিছু কড়া নিয়ম আছে। আমি সেটা ততটা অণুসরণ করতে পারিনি, চাইও নি। শুধু চেয়েছি তিন পংক্তিতে মনের ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় কি না, সেইটা পরখ করতে। অক্ষর বিন্যাসটির সজ্জা যদি জানতে চাও তো তা হল ৫-৭-৫, সাকুল্যে ১৭টি অক্ষর থাকবে যা তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে। তবে মার্কিন কবিরাও হাইকুর জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে এই ধরণের অণু-কবিতা রচনা করেন, কিন্তু এই ১৭ অক্ষর ও তিন বাক্যের বন্ধনকে খুব একট কঠোর ভাবে মানেন নি। তাঁরা জোর দিয়েছেন অল্পের মধ্যে মানেটাকে পরিস্ফুট করতে। আমিও সেই চেষ্টাই করেছি অপটু হাতে, যদি নিয়ম মানা হয়ে থাকে তা অজান্তেই।

১। চাঁদের আলো
নরম, মায়াময়
তবু মন পোড়ায়।

২। সোঁদা বাতাস
বেল - জুয়ের বাস।
বর্ষা আসছে ।

৩। ঘোর বৈশাখ
পিচের রাস্তা জুড়ে
লাল পলাশ।

৪। বসন্ত-সন্ধ্যা
মাতাল মন যেন
অন্য মনস্ক।

৫। রবি-সকাল
বৌ আরও ব্যস্ত আজ
স্বামী ঘুমিয়ে।

৬। নিজেরই রক্তে
ভেজা মাটির 'পরে
কৃষক মিছিল।

(সম্প্রতি কৃষকরা যে লঙ মার্চ করলেন, তাঁদের রক্তাক্ত পায়ের ছবি দেখে)

৭। আসিফা, দিব্যা
শৈশবের দরজায়
গুঁড়িয়ে গেল।।

ডাকে কি এসে যায়

নবনীতা ভট্টাচার্য

অধ্যাপিকা, সাংবাদিকতা বিভাগ

ডাকে কি এসে যায় ?

রাস্তা ঘাটে কাকু, বৌদি, দিদিমা, পিসিমা এই ডাকগুলি শুনলে বেজায় বিরক্তি লাগে। আমরা তো রাস্তায় বেরোলে কাউকে বোন, মা, পিসী, মাসি ভাবিনা। তা হলে কোনো অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে আমরা সব সময় সম্পর্কের সাহায্য নেব কেন ? সম্পর্ক মানে সাহারা, ভালবাসা, বিশ্বাস। রাস্তায় বেরোলে সবার আগে এই নিরাপত্তা হীনতায় এখন ভুগি আমরা। আজকাল বয়স্ক মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বাসের সিট আমরা ছেড়ে দিতে পারিনা। চক্ষু লজ্জা তাঁকে সিনিয়র সিটিজেনর সিটটায় গিয়ে বসতে অনুরোধ করি। বাচ্চারা স্কুল থেকে ফেরার সময় জায়গা না পেলে আমরা তাদের বসার সুযোগ করে দিতে পারি না । এমন কি বসে থাকার সময়ও আমরা দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের হাতের জিনিষপত্র কোলে নিয়ে বসতে পারি না। কারণ আমরা তখন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। প্রতিবাদের কণ্ঠ সেই কবেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে মরছে মরুক আমার কি। আমরা ভুলে যাচ্ছি এই আমি টা আসলে ওই আমরাদের একজন। কোনো মেয়ের শ্লীলতাহানি হোক বা কোনো ছেলেকে অকারণ লাঞ্ছনা করা আমরা সবেতেই নিরুত্তাপ। চুপচপ বসে বসে আমরা মনে মনে নিজেকে বিচারকের ভুমিকায় বসিয়ে ফেলি। ভাবতে থাকি মেয়েটার নিশ্চয়ই দোষ আছে, এক হাতে তো আর তালি বাজে না। বা ছেলেটার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা বলে উঠি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভয়ানক অসভ্য। লাগাও ঘা কতক। নিজের সিটে বসে নিজের ফোনে ব্যস্ত থেকে আমরা এইভাবেই আমাদের চরপাশে ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে উদাসীন থাকি। অথচ আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাতে আমরা বলি কেউ কি ছিলনা রাস্তায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কি করে থাকবে আপনিইতো আশপাশের বিপদ দেখে আকাশের মেঘ গুণছিলেন। আজকাল স্মার্ট ফোনের যুগ। এই ফোন আমাদের উদাসীনতাকে আরও অনেক বেশী ইন্ধন যোগাচ্ছে। আমরা ট্রেনে কাটা পড়ছি। বাসে ধাক্কা খাচ্ছি। রাস্তা ক্রশ করার সময় খেয়ালই রাখছি না পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বয়স্ক ভদ্র মহিলা বিড়বিড় করে বলছেন আমি কি করে রাস্তা পেরোবো । যা গাড়ি চলছে। তার হাতটা ধরে তাকে রাস্তাটা পার করে দেওয়ার পর যখন আপনি তার দিকে তাকাবেন তখন তার ওই নির্ভরতার হাসিটা হবে শুধু আপনারই পাওনা। কিন্তু এসব কে চায়। রাস্তার লোক মানে অনাত্মীয় । ভাই সম্পর্ক ছাড়া বাইরের

জগতের সব ডাক নিশির। সারা দিয়েছো কি মরেছ। ভ্রান্তিবিলাসের এই দৃশ্যটার মত। অপু অপু করে বাইরে থেকে উত্তমকুমার সাবিত্রীর নাম ধরে যত ডাকছে —— ততই বাড়ির ভেতরে থাকা লোকজন বলছে, সাড়া দিও না ও নিশির ডাক। আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা সবাই এই পৃথিবীর মানুষ। একই বাতাসে ভাগাভাগি করে শ্বাস নিয়ে থাকি। মাসি পিসি বলে কেন ডাকবো তবে আমরা ? কাকু ডাকা লোকটা যদি মেয়েটার কাধে পিঠে হাত দেয় তবে কোন্ ভরসাতে আমার বাড়ির মেয়েটি তাকে কাকু ডাকবে। ঘরের বাইরের পৃথিবীতে না আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না আমাদের কেউ বিশ্বাস করে। আমরা ভয় পাই ছোয়াছুয়ির আর অন্যেরা ভয়া পায় অসম্মানের। বাদ বাকিদের কাছে এই দুটোর কোনেটাই গুরুত্ব রাখে না। একমাত্র মা ডাকটাই এখনো আমাদের কিছুটা ভরসা যোগায়। জানি এতেও ফাঁক আছে। তবু খড়কুটোর মতন এখনো আমরা মা কে আঁকড়ে এগিয়ে যেতে পারি। দিদি ডাকলে কোথাও ভরসা লাগে। দাদা, ভাই এই ডাকগুলো অন্যদের কিছুটা ভরসা যোগায়। রাস্তাঘাটে যে কোনো সময় কোনো অসুবিধা হলে আমরা যে ভাবে আর যে ভাষায় বিরক্ত প্রকাশ করি তাতে ভালো জামা, কাপড় ব্যাগের আড়ালে আমাদের দাঁত নখ বেরিয়ে যায় । বড্ড অসহায় লাগে । কবে আমি বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করেছি আমার এক বন্ধু দূর থেকে দেখেই বুঝে গিয়েছিলো যে কণ্ডাক্টরের অবস্থা তখন বেজায় খারাপ ছিল। এই যে আমাদের দেখে ফেলার, চিনে ফেলার আর ভয় নেই। সেই বন্ধু আমার এখনও দেখায় সেই দিন সেই আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে আমি কি ভাবে যোগ বিয়োগ করেছিলাম । আসলে বাস্তবে আমরা যেই হই ভারচুয়াল ওয়ার্ল্ডে আমরা এখন লেখক, কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, শান্ত, মুখরা। আমরা মনে করছি ওটাই আমাদের আসল দুনিয়া যেখানে তালি কুড়ানোর জন্য আমাদের আসল আমিটাকে বের করার দরকার পড়ে না। তাতে বাস্তবের দুনিয়াতে আমাদের যতই দাঁত, নখ বেরোকনা কেন। তাই কানে ফোন গুঁজে যখন আমরা ভার্চুয়াল পৃথিবীতে দেশোদ্ধার করতে ব্যস্ত থাকি তখন খেয়াল থাকে না যে বাসের দরজায় দাঁড়ানো কারুর মা, আচমকা দেওয়া ব্রেক সমলাতে না পেরে পাশেই দাঁড়ানো বাসের তলায় গড়িয়ে গিয়েছে।

করুণাসিন্ধু রামকৃষ্ণ

দোলন সরদার
প্রথম বর্ষ, সংস্কৃত বিভাগ

যুগ অবতার যিনি রামকৃষ্ণ নাম
গদাধরের বেশে তিনি এলেন ধরাধাম।।
মর্তলোকে পা রাখলেন চন্দ্রমণির কোলে
গিরীশ, নরেন, রাখাল সবাই তাঁরই নামে ভোলে।।

রাসমণির মন্দিরে তিনি ভবতারিণীর ভক্ত
সর্বধর্ম সমন্বয়ে করলেন আসক্ত।।

মন্দির প্রাঙ্গণে ডাকতেন তিনি "ওরে সবে আয়"
কবে তোরা আসবি বাছা সময় চলে যায়।।

পত্নীরূপে সারদাকে করলেন মাতৃরূপে পূজা
জগৎধাত্রী যিনি তিনি সত্যিই দশভূজা।।

দয়া নয় 'প্রেম' দিতে হতেন কাতর
নরেন থেকে বিবেকানন্দে তাঁরই রূপান্তর।।

'যত মত তত পথ' তব শাশ্বত বাণী
কাণ্ডারী হয়ে ভবনদী পার করাবেন জানি।।

সবার মনেতে তিনি পরমহংস ভগবান
জয় জয় বল সবে রামকৃষ্ণ নাম।।

যে ধর্মই হোক, যে মতই হোক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে, তাই কোন ধর্ম, কোন মতকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে নাই। — শ্রীরামকৃষ্ণ

Today's Draupadi

Abhisikta Ghosh
1st Year, English Honours

Compliments adorned my simplicity,
And beautifying me was your sole job,
Did you care to notice my minute cracks ?
That hid my war-pride worth million dollars.

Judging gazes dampened my courage,
And the soft bearing, pinned 'good' on me.
Does beauty really lie in the eyes of the beholder ?
The very eyes that shun valiance.

Sparkling eyes in a picture define me,
Anorexia redefined as a way to size zero.
Did you see me transitioning ?
Instead of a simple leap to conclusions.

Loud makeup and short dresses,
Hair dyed in neon shades.
Does this new look not raise questions in you ?
Amazed I am at your awed self.

Eyes, lips, hair, in short my physique,
Overwhelmed you with lust.
Did you always seek a slut in me ?
Avoiding emanating rays of my bravery.

Not oriental or occidental female lead am I,
But a mixture of survivor and diehard lover.
Does grace persuade your views ?
From the grasp of fixed notions.

Fighter I am, with a child's heart,
Gorgeous I am with a deity's spark.
Did you yet decide to stop objectifying ?
Before this blunt knife turns sharp.

My desires reborned like a Phoenix,
Along with a modified thought process.
Does the reincarnated Draupadi in me urge your soul ?
To answer my questions from past and present.

কলকাতায় শীতের সকাল

সুস্মিতা ঘোষ

বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ,

শীতের ছোঁয়ায়, হিমেল হাওয়ায়
লেপের আদর ছেড়ে
শরীর যে আর মানতে না চায়
গরম আবেশ পেয়ে।।

চায়ের কাপে, ঠোঁট ডুবিয়ে
মন যে ওঠে জেগে
কুয়াশামোড়া ধূসর আকাশ
শান্ত শহর দেখে।।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখে
শিউরে ওঠে গা,
মরার মতো পড়ে আছে
ছোট্ট ছেলেটা।।

গায়ে নাই তার কোনো জামা
হাড় জিরজিরে চেহারাখানা
রাত্রিজুড়ে শীতের আঁচড়
গভীর জ্বরে দেহ কাতর।
হুঁশ হারিয়ে, রাস্তায় পড়ে,
কেউ নেয় না আপন করে
প্রাতঃভ্রমণে কিছু লোকে
ঘৃণা চোখে তাঁকেই দেখে।
কিছু আবার আহা ! বলে
চোখ ফিরিয়ে আবার চলে।।

সভ্য শহরের একি দশা!
মানবিকতাই এদের ভাষা।।
কালচার আর রীতিনীতি
ধারেপাশে কারো নাই স্থিতি
উৎকৃষ্ঠ নাগরিকতা, বড়াই এদের সভ্যতা
শহুরে আমি শহুরে তুমিও
এমন করেই চলব
সকাল হতে ইন্টারনেটে
সুপ্রভাত বলব।।

বিচ্ছিরি সব দৃশ্যগুলো,
আমার চোখেই পড়ে ??
আবেগ, বিবেক ঘুমিয়ে পড়ে
নাগরিকতার ঘোরে।।

বৃষ্টি

অস্মীতা মন্ডল

প্রথম বর্ষ (সাম্মানিক) শিক্ষাবিজ্ঞান

বৃষ্টি মানেই মেঘলা আকাশ
অন্ধকারের আলো
বৃষ্টি মানেই ঝাপসা সকাল
লাগে বড়োই ভালো।
বৃষ্টি মানেই মিষ্টি গান আর
চেনা সেই সুর,
বৃষ্টি মানেই মানছেনা মন
আকাশটা বহুদূর।।
বৃষ্টি মানেই আরাম বাতাস
শীতের চাদর গায়,
যাচ্ছে খোকা খুব যে বোকা
ওই যে দেখা যায়।
বৃষ্টি মানেই একঘেয়ে সুর,
ঝমঝম টাপুর টুপুর
বৃষ্টি মানেই যখন তখন
দূরের পাখির ডাক।
রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ফেরি,
দিচ্ছে কত হাঁক।।
বৃষ্টি মানেই বন্ধু-বান্ধব
কত আড্ডা মজা ভারি,
আস্তে-আস্তে পেরোয় সময়
রয়ে যায় স্মৃতি তারই।
বৃষ্টি মানেই ভালো-খারাপ
ভেজা মাটির গন্ধ,
লিখছি বসে খাতার পাতায়
ভালো লাগার ছন্দ।।

"হাতের নাগালে সাগর পাড় ; মনের শান্তি মন্দারমণিতে"

পৌলমী লাহিড়ী

দ্বিতীয় বর্ষ (সাম্মানিক), ইংরাজী

আমি বাঙালী। বিশেষ উৎসাহ নিয়ে বললাম, কারণ বাঙালী মাত্রেই নির্ভেজাল ভ্রমণপ্রেমী। তা সে হোক যতোই কাছাকাছি, বাক্স-প্যাঁটরা গুটিয়ে বেড়িয়ে পড়লেই হলো। কলেজ এর বজ্র আঁটুনীর ফস্কা গেরো, কিন্তু ওই পরীক্ষা শেষে শনি-রবি। আর একটুখানি নিরিবিলি বেশ ভালোই লাগে। কোথায় যাবো ভাবতে ভাবতেই হাতে পেয়ে গেলাম ছুটি। ব্যাস, চললাম পরিকল্পনাহীন ডেস্টিনেশনে।

যদিও সমুদ্র প্রেমী নই, তবু ঘুরতে হবে, তাই আচমকা সব গুছিয়ে চললাম এক শনিবারের সকালে। মা-বাবা, পিসি-পিসেমশাই, মামাবাবু আর আমি, ছোট্ট টিম্ আমার। সকাল সাতটা, ধর্মতলা থেকে একখানা নীলরঙা A/C বাস রওনা দিল। গন্তব্য দীঘা, তবে আমরা যাচ্ছি মন্দারমণি। কলকাতা থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে, ভীষণ একলা থাকার আদর্শ জায়গা কিন্তু মন্দারমণি। বাস ছুটল নিজস্ব ছন্দে। ঘন্টা দেড়েক পর বাস থামলো কোলাঘাটে। নামলাম একবার। ইতিমধ্যেই বাঙালীর ভোজনরসিক সত্তা জেগে উঠছে তা বুঝলাম অন্যান্য সহযাত্রীদের উশখুশানিতে। জলযোগ সেরে আবার ছুটল বাস। অধিকাংশ সহযাত্রী যাচ্ছেন দীঘা। আমরা নামলাম চাউলখোলা বাস স্টপে। একটা গাড়ি ভাড়া করে আরো দশ কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছলাম গন্তব্যে। ধু ধু মাঠ আর সরু ফাঁকা একটা রাস্তা পেছনে ফেলে হঠাৎ করেই সাক্ষাৎ সমুদ্রের সাথে। রিসর্ট বুকিং করাই ছিল। নিজ নিজ কটেজে ঢুকে পড়লাম আর তারপর চেঞ্জ করেই দে দৌড়.... সোজাআআ সমুদ্রে...। হুটোপাটি করে নিলাম অল্প সময়ের মধ্যেই। সব চেয়ে ভালো লাগলো জায়গাটা বড় শান্ত। খামোকা হই হুল্লোড় নেই। সমুদ্র যদিও আরো শান্ত, ঢেউ এর গর্জন নেই পুরীর মতো।

মন্দারমণিতে বিকেলটা কাটানো হয়নি। আমার ইচ্ছে ছিল রিসর্ট এর বাগানে খোলা আকাশের নীচে বাঁশের খাটিয়াতে বসে বসে ঢেউ গোনার। বাবাও এই প্রস্তাবে রাজি হত *জানি, কিন্তু বাকিদের কথাও ভাবা উচিত... আমি আমার এমন আজব ইচ্ছের কথা বলিনি বাকিদের ব্যাজার মুখ দেখার ভয়ে ... পৌনে দুই দিন এর সফর ; তাই হইচই করলে মন্দ* নয়। বিকেল বিকেল গাড়ি ঠিক করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম, গেলাম দীঘা। আমি আগে দীঘা এসেছিলাম একবার সে যদিও ২০০৪ সাল, মনে নেই তেমন কিছু, মনে রাখতেও

চাইনি আসলে। যাই হোক ওল্ড দিঘায় গাড়ি থেকে নেমে বেশ চমকে গেলাম, এত্তো লোক..! তাহলে কী কোলকাতা ফাঁকা ? না তা তো হবে না। তো যাই হোক, বিচিত্র মানুষজন, বিচিত্র তাদের আচার আচরণ। কারো মধুচন্দ্রিমা, কারো পরকীয়া, কারও ফ্যামিলি ট্যুর.. বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া চোখে পড়ল, "বাডি'স ট্রিপ" না কি যেন..! বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে জীবনসঙ্গীনির কাঁপা হাতটি মুঠোবন্দি করে জীবনের শেষ বেলায় সাগরের বুকে সূর্যডুবি দেখতে এসেছেন বেশ কিছু দম্পতি। সন্ধ্যে নামতেই রাস্তার ওপর হকার এর ভিড়। টুকিটাকি কেনাকাটার মধ্যে হঠাৎ দেখি হকার সব পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড়েছে। ভিড়ের মধ্যে শোনা গেল, "আসি গিলা.." মানে পুলিশ আসছে। এবার নিউ দীঘা গিয়ে নিজেদের মত কিছু কেনাকাটি করে আবার টু মন্দারমণি। জমজমাট সান্ধ্যভ্রমণ হলো বটে।

পরদিন রবিবার। কচি পাঁঠার ঝোল আর গরম ভাতের বদলে এই রবিবারটা কাটল মাছের রকমফের দিয়ে। ভোরবেলা পূবের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে সমুদ্দুর এর কোল থেকে আকাশ আলো করে এলো সূয্যিমামা। মন্দারমণির সমুদ্র শান্ত, তাই একটু সাবধান থেকে অনায়াসে সমুদ্রস্নানের মজা নেওয়া যায়। ইতিমধ্যেই বেলা গড়িয়ে এল। মধ্যাহ্নভোজের পর ছোট্ট বিরতি। অবশেষে ছুটি শেষ। বাড়ি ফেরার পালা। এক রাশ মন খারাপ নিয়েই রওনা কোলকাতার উদ্দেশ্যে।

দারুন সুন্দর কাটলো সময়টা। সপ্তাহান্তেও নির্বাসন। তবে এ নির্বাসন বড্ড কাম্য ভিড় ঠাসা কোলকাতা থেকে ছুটি পাওয়ার জন্য। ইচ্ছে রইলো আবার আসবো। কংক্রিটের ঢাকা ধোঁয়া ধুলোর শহর থেকে পালিয়ে এসে মন ভরাতে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলো মন্দারমণির ভিজে হাওয়া।

পরিবেশের প্রতি মানুষের অত্যাচার

শ্রেয়শ্রী কর্মকার

তৃতীয় বর্ষ (সাম্মানিক), দর্শন

আমাদের এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, জল, উষ্ণতা, শীতলতা, দিন-রাত্রি, ঋতু পরিবর্তন, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, প্রভৃতি নিয়ে যে সমগ্রতা, তাই হল পৃথিবী। এবং এই পৃথিবীর অন্তর্গত প্রতিটি জীব ও জড় পদার্থ নিয়েই আমাদের স্বাভাবিক পরিবেশ।

প্রথমদিকে পৃথিবীর বুকে কেবলমাত্র জল, আলো, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, দিন-রাত্রি, ঋতু পরিবর্তন, প্রভৃতি নিয়েই গঠিত হয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটল। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব হতে শুরু করল। এই ভাবে ক্রমশ পরিবর্তন হতে হতে পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার, থেকে বিবর্তনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। বিবর্তনের ফলে পর্যায়ক্রমে মানুষও উন্নত হয়ে উঠতে থাকে। এই ভাবেই মানুষ পা দেয় আধুনিকতার জগতে। মানুষ যত আধুনিক হতে থাকে তার প্রভাব পড়তে থাকে সম্পূর্ণ পরিবেশের উপরে। নিদারুণ জনস্ফীতির ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য, বাসস্থান যোগানোর জন্য, মানুষ বহুমুখী বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে বনজঙ্গল কেটে, পুকুর বন্ধ করে, অ্যাসিডের দ্বারা বড়ো বড়ো বৃক্ষের ক্ষতি সাধন করে মানুষ তার নিজেদের সমস্যা সমাধান করছে। তার সম্পূর্ণ প্রভাব পড়ছে এই পরিবেশের উপর। যার কারণে সমগ্র পরিবেশ আজ দূষিত। কারণ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তথা সকল প্রাণীজগতের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, তা আমরা এই বৃক্ষ থেকে পাই। এইভাবে বৃক্ষ কেটে দেওয়ার ফলে সকল প্রাণীজগৎ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছেন প্রাণকে, আর চারিদিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন, কিন্তু মানুষ নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। লুব্ধ মানুষ অরণ্যের ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতি ডেকে এনেছে ; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার, বৃক্ষের উপর, যার পত্র মাটিতে পড়ে মাটির উর্বরতা বাড়ে, তাকেই সেই মানুষ নির্মুল করছে। অমিতাচারী লোভী বা অপরিণামদর্শী মানুষ মনুষ্যজাতির স্থায়ীত্বের চিন্তা না করে স্বল্পস্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৃক্ষ তরুলতাকে নির্মম ও নির্বিচারে ধ্বংস করে সেখানে ইট-কাঠ-পাথর এর শহর-নগরের, কলকারখানা দ্বারা পরিবেষ্টিত শিল্পনগরের পত্তন করেছে, যা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত করে চলেছে। মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের জন্য বন্যপ্রাণী ও অরণ্য সম্পদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। পৃথিবীময় আজ বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হচ্ছে ; তার ফলে বালি উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্র করছে। গাছ কাটার ফলে মাটির ধারন ক্ষমতা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট পরিবেশে অক্সিজেনের

পরিমাণ কমে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলস্বরূপ গ্রীনহাউস গ্যাস আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি করছে। কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে ওজোন গ্যাসের স্তরের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর গড়ে প্রায় দু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীর যে এক অংশ স্থলভাগ, সেটুকুও জলমগ্ন হবে। অতএব, এই সংকট মুহূর্তে পরিবেশ দূষণকে রোধ করতে না পারলে পৃথিবী একদিন জীবশূন্য হয়ে পড়বে।

এখন অনেক মানুষ বলতে পারেন যে, কেবলমাত্র এই জগতে যেহেতু মানুষেরই একমাত্র নৈতিক বিচার করার ক্ষমতা, বাক্ স্বাধীনতা ও বুদ্ধি আছে, তাই মানুষের সুখের জন্য ও তার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সে পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু বৃক্ষ, পশুপাখী প্রভৃতি জীবের কোনো বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা, প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রভৃতি নেই, তাই তাদের সব অত্যাচার সহ্য করেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে। আবার জগতের উন্নতিতে মানুষেরই অবদান বেশী, তাই তার সুখের জন্য অন্যের জীবন বিপন্ন হতে পারে। আবার একদল মানুষ বলে, পরিবেশ আমাদের জল, অক্সিজেন, বাসস্থান, খাদ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, তাই তার পরিবর্তে আমরা তার ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকব। এবং আমরা প্রয়োজনে একটি গাছ কাটলে তার পরিবর্তে আরও পাঁচটি গাছ লাগাব। একমাত্র মানুষই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব, তাই তার পরিবেশের প্রতি সকল নৈতিক আচরন পালন অবশ্য কর্তব্য। আমরা বলি যে মানুষ তার প্রয়োজনেই পরিবেশকে ব্যবহার করবে, তাহলে এটাও বলতে পারি যে, মানুষই একমাত্র পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আবার বলা যায় যে, পরিবেশ আমাদের প্রয়োজন সাধন করে বলেই আমরা তার প্রতি এরূপ সিদ্ধান্ত নেব সেটা সঠিক বলে মানাও যায়না। যেহেতু তারাও এই পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছে, বিধাতা তাদের মধ্যে প্রাণ দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাই তাদেরও পরিবেশে বেঁচে থাকার একটা নৈতিক অধিকার আছে বলে মনে করা হয়। মানুষ কেবলমাত্র তার প্রয়োজন সাধনে পরিবেশকে কোনো ভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেনা, বা একদিক থেকে বলা যায় তার কোনো অধিকার নেই। তাই বলা যায় এই অধিকারের ভিত্তিতেই আমরা পরিবেশকে রক্ষা করব। মার্কিন দার্শনিক জর্জ সেশনস্ (George Sessions) তাদের এক নিবন্ধে এপ্রকার পরিবেশের নৈতিকতা অনুসরনের জন্য কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন—

(i) এই জগতে মানুষের এবং মনুষ্যত্তের জীবজন্তুর কল্যাণ, বৃদ্ধি ও বিকাশ সততই মূল্যবান পদার্থ। পশু পক্ষীর মূল্য পরকীয় নয়, মানুষের স্বার্থ সাধনের জন্যই তারা মূল্যবান নয়, তাদের প্রত্যেকে স্বকীয় মূল্যে মূল্যবান।

(ii) জীবের নানাত্ব এবং জীবনশক্তির প্রাচুর্যের মাধ্যমেই জীবনের মূল্যকে চরিতার্থ করা যায়।

(iii) প্রাণ ধারণের ঐকান্তিক প্রয়োজন ছাড়া, জীবের প্রাচুর্যের, জীবনশক্তির ঐশ্বর্যের ক্ষতিসাধন করার অধিকার কোনো মানুষের থাকতে পারে না।

সবশেষে একথাই বলা যায়, মানুষের অগ্রগতির জন্য উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু পরিবেশকে ক্ষতি করে নয় বরং পরিবেশকে রক্ষা করে।

রাশিফল!!

বীণা বালী
তৃতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগ

'মানুষ' এই শব্দটির অর্থ বলতে বোঝায় 'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব' অর্থাৎ যার বুদ্ধি আছে কিন্তু মানুষের বুদ্ধি থাকলেও সে নিজের অজান্তেও কত বোকামি করে থাকে। যেমন মানুষ আজও অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী। এমনকি মানুষ রাশিফলে লেখা ভবিষ্যৎবাণীকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। এখানে আমি আমার বিদ্যাভবনের একটি ঘটনাকে তুলে ধরতে পারি। আমাদের কলেজে লাইব্রেরিতে প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ রাখা থাকে যাতে ছাত্রীরা কলেজের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বাহিরের জগৎ সম্পর্কে নিয়মিত খবর জানতে পারে। এই খবরের কাগজে খবরের সাথে রাশিফল দেওয়া থাকে। কোনো কোনো ছাত্রীরা নিয়মিত সেই রাশিফল লক্ষ্য করে এবং আমিও তার মধ্যে একজন। আমিও যখন লাইব্রেরিতে যাই তখন একবার খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিই এবং সর্বপ্রথম চোখ যায় রাশিফলে। কিন্তু কোথাও না কোথাও আমরা জানি এসবই মিথ্যা এবং আমাদের বোকা বানানোর পদ্ধতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এটাকে সত্যি বলে মেনে চলি। যেমন এই রাশিফলে কখনো লেখা থাকে 'আজ কোনো সুখবর আসবে' সেক্ষেত্রে আমরা ভাবি বা! আজকের দিনটা নিশ্চয় খুব ভালো কাটবে। সারাদিন অপেক্ষায় থাকি সেই সুখবরটা কখন আসবে। যদি আকস্মিকভাবে সত্যিই কোনো সুখবর এসে থাকে তাহলে আমরা ভাবি রাশিফলে যা লেখা থাকে তাই হয়। আর যদি নাও আসে তাতেও আমরা কিছু মনে করি না, আবার পরের দিন উৎসাহ নিয়ে দেখি আজ কি লেখা আছে।

আমি এই বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখলাম যে, আমরা কেন বিশ্বাস করি যে, রাশিফলে যা দেওয়া থাকে সব ঠিক এবং সেগুলো কীভাবে প্রায়ই আমাদের জীবনের সাথে মিলে যায় ? 'বর্তমান' পত্রিকাতে রাশিফলে একটি করে শব্দ দেওয়া থাকে অথচ প্রত্যেকদিন ২৪ ঘন্টায় আমাদের সাথে কত কি না ঘটে যায়। ধরা যাক্ সারাদিনের মধ্যে সকালে হয়তো মা বকল তখন আমি কষ্ট পেলাম। দুপুরে একটা চিঠি আসল যে আমি চাকরি পেয়ে গেছি সেক্ষেত্রে আমার কাছে এটা একটা সুখবর। আবার রাতে হয়তো বন্ধুর বিয়ে ছিল সেখানে প্রচন্ড আনন্দ করলাম। এখন আমি সকালে রাশিফলে দেখেছিলাম যে, আজ কষ্ট পাবার কথা লেখা আছে সেক্ষেত্রে সকালে যেহেতু কষ্ট পেয়েছিলাম তাই ভাবলাম

রাশিফল মিলে গেছে। আর যদি লেখা থাকতো সুখবর আসবে তাহলেও ভাবতাম রাশিফল মিলে গেছে। অর্থাৎ এই রাশিফল সবই মিথ্যা তথ্য যেটা কখনো মিলে যায় আবার কখনো মেলে না।

আমরা আর একভাবে বোকা হই সেটা হল— যখন কোনো জ্যোতিষী আমাদের হাত দেখে কোনো ভবিষ্যৎবানী করে তখনও আমরা সেই ভবিষ্যৎবাণীকে বিশ্বাস করি। আমি এর একদম বিরোধী। আমি নিজে মনে করি যে, আমরা নিজেদের সাথে নিজেরা ২৪ ঘন্টা, সাত দিন ও বারো মাস কাটাই, নিজেদেরকে খুব ভালোভাবে চিনি যেখানে আমরা নিজেদের সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারি না যে, আমার মনে যে লক্ষ্য আছে সেটা আমি পূরণ করতে পারবো কি না, অথবা আমি কি চাই ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে একজন ভুয়ো জ্যোতিষী কীভাবে মিনিটের মধ্যে কেবল হাত দেখে আমাদের ভবিষ্যৎবাণী করে যে, তোমার এই সময়ে চাকরি হবে, এই সময়ে বিবাহ হবে বা এই সময়ে বিপদ আছে ইত্যাদি। আমি কখনোই বলছি না যে, সব জ্যোতিষী ভুল তথ্য দেয় তবে বেশিরভাগ ব্যক্তি নিজেকে জ্যোতিষী হিসাবে দাবি করে একটা চেম্বার খুলে রোজগারের একটা উপায় পেয়েছে। এখানে আমি কখনোই কারোর বিশ্বাসকে অপমান করছি না বা কারোর বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে বলছি না আমি কেবল বলছি আমরা যেহেতু মানুষ তাই কোনো বিষয়কে সত্য বলে দাবি করার আগে তাকে যুক্তি, বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করে তবেই বিশ্বাস করা উচিত।

WOMAN AS GHOST AS GOD

Akanksha Krishnatre
1st Year, English Honours

I am a woman
As ghost as God.
With vericose veins
Running behind her eyes
Travelling her body
Like a gypsy
In search of a home.
Veins that are coiled
And entangled.
Not destined to be pulled apart
Filled with grief, guilt and passion
Burning in her heart.

I am Pandora.
With all her beauty
And gifts she was bestowed upon.
I have curiosity
Dancing upon my fingertips
And an urge to defy
Those who claim their rights to my body.
I pry open the flesh with nails bare.
Just as the lid slips off the box.
And all that is evil is left to flourish.
Beneath a mans' brow.

And I am the Pandora
Who gives birth to hope
When all seems dead
Even though

I was tricked into it.
I am Eve.
Another of those beautiful maidens
With curves so perfect
And body,
Like that of
Carved out of pure marble.
First of her kind,
They said.
Guilty of banishment
From the Garden of eden,
The paradise.
They were born after.
The paradise
They sing false hymns about
Even though
I was tricked into it.

I am a Woman
As ghost as God
Mentioned so many times in history.
Every time written
As the beautiful maiden
With a new metaphor for body.
The breasts as tender and firm as marble
And thighs the colour
That of the melting rose.
Hair, like silken threads of heaven.
Binding her soul.

And every time the poet's
And myths and epics
Wrote about the wars .
They said,
It started by the vespertine beauty

Of a careless maiden,
The damsel in distress.
The root of all evil.

Never once mentioning,
Always failing to remind
That the jealousy of man
And pride on their
Beautiful, glorious, fleshy, alive possessions
Threw them into wars ;
And not mountains and plateaus of flesh
I carry upon my soul.

And because I am a Woman
As ghost as God.
With veins varicose
With grief and guilt and passion in my bones,

I stand
With graveyards of my soul
And bones as pyres to burn tales
They fabricate of my wrong doings.
Where I was never to blame.

And I have grief
For the tales and lies
They brandished before me.
And I could not speak.

I have guilt
For not standing
As ghost as God
When they changed my body
Into bare naked metaphors

To please their lowly lords
And shackled my mind
And wit and knowledge
Into chains of evil.
They claim were mine
And I never gave birth to.

I am a Woman
As ghost as God.
And now I have passion
To 're write stories
To create history
And retell the tales they told.
With myths at the bottom of jar
And truth finally set free.

I am not a mere woman.
I am an Idea.
To right the wrongs,
They wrote.
To erase the blame,
They placed.
And to recreate history
They left behind.

Because
I am more than flesh.
More than metaphors
That surround my body.

I am a woman
As ghost as God.

———

SYMPHONIES OF THE WIND

Rishika Ghosh
1st year, English Honours.

She wants to chant with the symphonies of the sky
And whirl pirouettes with the wind
She wants the clouds to intone,
Their everlasting melodies of teardrop tantrums
And drizzle with them.

Speckles of rainbow
She wants them to let them be
Like the eye of the storm.
Lightening, thunder, terror flying by,

Shades of glass, lost voices, anguishing fury and horror heaved
With each breath of the wind.
But as the eye of cloudburst,
She wants to discover peace within.

"Crack of Dawn"

Dipanwita Biswas

3rd Year (Hons.) English

Gently glooming the lofty Dun !
Amid the haze,
Grows the fitting Sun.
Peeps from the East
In Crimson frame,
Arise from the list
In his mentioned lane.
Brighten the world
With warbling note !
Lingering, the air
Wraps in a youthful coat.
Rolls up the Dawn.
In such way
As to us it has,
A lot to say.

পাখি

সম্পা মন্ডল

তৃতীয় বর্ষ (সাম্মানিক) বাংলা

ক্লাসের পাশে জামগাছেতে
ডাকে একটি পাখি।
কি পাখি তা দেখার জন্য,
সবাই মারছে উঁকি ঝুঁকি
পাতার নীচে লুকিয়ে পাখি
দেখা নাহি যায় ;
তবু সেই পাখিটি দেখার জন্য
মন বসেনা খাতায়।।
লেখা ছেড়ে আমার এখন
তারই দিকে মন ;
কেন পাখি চিৎকার করে
ডাকছে সারাক্ষণ ?
ডাক শুনেও যায় না বোঝা
পাখির পরিচয় ;
ক্লাসের ম্যাম পাখি দেখতে
চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়।।
গাছের পানে তাকান তিনি
পাখি দেখার আশায় ;
তবু পাখি দেয়না দেখা
লুকিয়ে গাছের পাতায়।
দেখতে না পেয়ে পাখি
তিনি ছাড়েন আশ ;
পাখি যখন বাইরে বেরোয়
তিনি টেবিলের পাশ।
পাতা থেকে বেরিয়ে পাখি
যায় উড়ে দূরে
সেই ছবিঠি কেবলমাত্র
আমার চেখেই পড়ে।।
অন্য পাখি নয় এটা
সুরের যাদুকর ;
অসময় বলেই এখন
তার ভেঙেছে স্বর।
বসন্তকাল এলেই পাখি
ডাকবে মধুর সুরে
মুহূর্তেকে উড়ে গেল
পাখি অনেক দূরে।।

কাজই লক্ষ্মী। কাজে দেহ মন ভাল থাকে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। —সারদা দেবী

সাত ভাই চম্পা

রিন্তা ঘোষ
বাংলা (সান্মানিক), দ্বিতীয় বর্ষ

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
সাতটি চাঁপা ভাই,
রাঙাবসন পারুল-দিদি
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনা মুখ।
করতেছে টুক্‌টুক্।

ঘুমটি ভাঙে পাখির ডাকে
রাতটি যে পোহালো
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মতো আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের করে
কী দেখছে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধরে।

নীরবতা

রিয়া রায়
দ্বিতীয় বর্ষ (সান্মানিক), শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ,

নীরব আমি, নীরব তুমি
নীরবতার শেষ দরজায় দাঁড়িয়ে আমি
ক্লান্ত সকল মানব সমাজ
নীরব হয়েও চলে তাদের বাহ্যিক সাজ।
পাখির কলরবে যদিও ভোর হয়।
ঝিঁঝির ডাক সেই কালো রাত মনে করায়।
ভাবি শুধু কী উপায়ে, কেমন করে ?
উজ্জ্বল রবি দেবে দেখা কালো মেঘের পরে
আসবে নতুন দিন, ঝলমলিয়ে আলো
আবারো নামবে সন্ধ্যা সব নিভিয়ে আলো।
নীরব সেই সব মানুষ ভীড় জমায়
ডুব দিয়ে আপনার মনের কিনারায়
শুধু নীরব থাকি আমি, মগ্ন আমাতে
গভীর রাতের সেই নিশ্চুপ তারাতে।

TRUTH IS NOWHERE

Indrani Mukhopadhyay

Ex-Student (Department of English)

Truth was believed.
It was the time,
When the court was fine,
Where Draupadi was undressed
She had faith
In the myth
Of the Divine essence named as Kanha.
But it was the Saree
Which rescued Panchali
From the bunch of Ashuras.
Demons then had made their presence, prominent.
How can Kanha be the dominant ?

Truth is believed,
To forbid women who bleed
As they are quintessentially impure
To touch God's feet.
Where lies this God ?
I know not but he is blind,
Whose other name is "Dhamma"
And never befits for "Kamma",
As his voice was in vain
When the eight year old cried out in pain.

সেমেস্টার

সুচেতনা হাউলি

সেমেস্টার সেমেস্টার
শুনে কান ঝালাপালা
শুধু শুধু বই পড়া
নেই কোনো খেলাধুলা।।

কম সিলেবাস বেশি নম্বর
খুব বেশি সোজা।
সোজা কাজই কঠিন হলো
মাথায় চিন্তার বোঝা।।

নতুন কলেজ নতুন ক্লাস
আনন্দ নেই মনে।
দিনগুলো যে যাচ্ছে চলে
ক্রেডিট গুনে গুনে।।

ছটা মাস কেটে গেলো
পরীক্ষাও এসে গেলো।
একটু তাকিয়ে দেখো
আমাদের অবস্থা কেমন হলো।।

মনুষ্যত্ব

বীণা বালী
তৃতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগ

ভুলের চিন্তা না করে
শিখতে চাই বেশি
অনেক কিছু চাই না
অল্পেই থাকি খুশি
সুখ আর শান্তিটা
থাকনা সবার জন্য
মনুষ্যত্ব সবার আগে
হোক অগ্রগণ্য

ধর্ম এমন একটা ভাব, যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। —স্বামী বিবেকানন্দ

'মা'

সুস্মিতা ঘোষ

প্রথম বর্ষ (সাম্মানিক) বাংলা বিভাগ

জয়রামবাটি গ্রাম মহাপূণ্যধাম,
সেথায় জন্ম নিলেন মা ঠাকুরান।।
জগৎমাঝে পরিচিতি শ্রীমা সারদা,
অনন্তস্বরূপ তিনি মহামায়ারূপা।।
রামকৃষ্ণ জগৎগুরু ভক্তিমনকায়,
পুষ্পচয়নে পুজিলেন জগৎমাতার পায়।
আদ্যাশক্তি রূপিনী করি মহাজ্ঞানে,
ষোড়শী পূজা করিলেন স্ত্রীর চরণে।।
শূণ্যকোলে সারদাময়ী বলেন স্বামীর তরে,
কবে শুনিব মা ডাক এই অন্তরে ?
হেনকালে সত্যি হল ঠাকুরের সেই বাণী,
মা, মা ডাক শুনে পাগল ঠাকুরানী।।
মানব রূপিনী মাতা তিনি,
জীবন তারই শিক্ষা।।
কথার ছলে সরলাময়ী,
দিয়ে গেলেন দীক্ষা।।
পবিত্র জীবন মার, পবিত্রতাই বাণী,
স্নেহশীলা মাতা তিনি সকলের জননী
শাশ্বত বাণী মায়ের সদাই উদ্দীপ্ত হয়,
আর কেউ না থাকুক, আমি আছি নিশ্চয়।

'আমি হতে চাই....'

রিয়া বাহাদুর

প্রথম বর্ষ (সাম্মানিক) ইংরাজি

আমি হতে চাই সকলের ধ্রুবতারা ;
দীপ্তি যার রয়েও অধরা।

আমি হতে চাই মৃত আগ্নেয়গিরি
ক্ষতি নেই তবু ভয়ঙ্করী।

আমি হতে চাই প্রকৃতির নীরবতা,
যা সৃষ্টি করে একান্ত মনের কথা!

আমি হতে চাই বন্ধু সবার
নয় তো কারো একার

ধরার মাঝে রহিতে চাই অধরা,
আমি হতে চাই স্থির জলে চাঁদের ছায়া।।

'নবদিগন্ত'

মাধবী মিস্ত্রী

তৃতীয় বর্ষ, বাংলা (সাম্মানিক)

মনের আকাশে
সাঁঝ সকালে আঁকি দিল কি যে সুর
দোদুল দোলায় দোলে এ মন
কবির মনে সুর।
নিশীথের সেই ঘনকালো মেঘ
আঁধারে গেছে যে লুকায়ে
শতশত মৃত্যুকলেবর রয়ে গেছে পিছু পড়ে
সুনীল আকাশ, শান্ত বাতাস
ধরাদিল নবরূপে।
শ্রান্তি-ক্লান্তি ব্যথিত পাষাণ
গেছে যেন সব চলে।
নতুনেরে নতুন করে হয়েছে
আজিকে লেখা।
বিশৃঙ্খলার প্রাচীর ভেঙে
দেখা দিল এক নব দিগন্তরেখা।

আলো—আলো নিয়ে এসো, প্রত্যেকের কাছে জ্ঞানের আলো নিয়ে এসো। যতদিন না সকলেই ভগবান লাভ করে, ততদিন তোমাদের কাজ শেষ হবে না। দরিদ্রের কাছে আলো নিয়ে চলো, ধনীর কাছে নিয়ে এসো আরও অধিক আলো— কারণ দরিদ্রের চেয়ে তার আলোর প্রয়োজন বেশী। ... এইভাবে সবার কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দাও— বাকি যা, তাই প্রভুই করবেন, কারণ তিনিই তো বলেছেন, 'কাজেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।'

— স্বামী বিবেকানন্দ

গোলাপ

সুকৃতি পাত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ছোট্ট একটি ফুল
নামটি যার গোলাপ,
যার বিনিময়ে পরস্পরের
জমে ওঠে আলাপ।।

ফুলের ওপর প্রজাপতি
বসে আর যায়,
মধু খেয়ে চলে গেলে
গন্ধ নিয়ে যায়।।

নতুন করে জন্ম নিলে
যত্ন করে রাখি,
কেউ যেন না ছিন্ন করে
সেটাই খেয়াল রাখি।।

দেখতে তোমায় কতই ভাল
ওগো সুন্দরী,
তাইতো তোমায় ভালোবেসে
নিয়েছি আপন ক'রি।।

নববর্ষে শুভেচ্ছা থাক
তোমার হাতটি ধরে,
নতুন বছর সুখের কাটুক
এই কামনা ক'রে।।

ইতি দিয়ে প্রীতি
শেষ করি তাই,
ছোট্ট একটি গোলাপ দিয়ে
সবার মন ভরাই।।

'ফেলে আসা স্মৃতি'

সোনালী নন্দী

ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি
আমি ভালোবাসি নীল আকাশ,
সবুজমাঠ, আর ওই নদী
আরও ভালোবাসি ভালোবাসতে।
আমি ভালোবাসি আমার ছোট বেলা।
মায়ের বকা খেয়ে ঘুম থেকে ওঠা,
চোখ মুছতে মুছতে পড়তে যাওয়া
হইহই করে স্কুল থেকে ফেরা।
আর বৃষ্টির দিনে ছাতা থাকা সত্ত্বেও
ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরা।
আমি ভালোবাসি এই সবকিছু ;
আমি ভালোবাসি পাখির কিচির মিচির
শীতের ভোর আর বসন্তের বিকেল।
আমি ভালোবাসি ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের
সাথে সারাটা দিন কাটাতে।
তাদের সাথে খেলতে, হাসতে
আর তাদের সাথে নিজের ছোটবেলাকে
আবার নতুন করে ফিরে পেতে।।

বসন্তের আগমন

সুস্মিতা ঘোষ

প্রথম বর্ষ (বাংলা বিভাগ)

এসো বসন্ত, এসো হে
নিয়ে কৃষ্ণচূড়ার ডালি।
তোমার আগমনে কুহু কুহু রবে,
কোকিল ডাকে খালি।।
দখিনা বাতাস, মিষ্টি সুবাস
মাতিয়ে তোলে মন।
গাছে গাছে শুধু ফুলের শোভা
হয়তো একেই বলে
বসন্তের আগমন!

"একটি মেয়ের আত্মকথা ?"

প্রীতি দে

প্রথম বর্ষ (সাম্মানিক), দর্শন বিভাগ

প্রথমেই সেই মহান সৃষ্টি কর্তাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম, যিনি এই ছোট্ট মেয়েটিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। দিনটি হলো ২০০০ সালের অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ। এই ছোট্ট মেয়েটি জন্ম গ্রহণ করলো এক গরীব সাধারণ পরিবারে। তার বাবার জীবিকা হিসাবে ছিল রাস্তার উপরে ফুটপাতে একটা ছোট্ট চপ্‌ের দোকান। তার পিতার নাম স্বর্গীয় সুন্দর দে এবং মাতার নাম সরস্বতী দে। এই ছোট্ট মেয়েটির আগে তার বাবা-মা-র দুটি সন্তান বলতে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের পুত্র জন্মানোর কয়েকদিনের মধ্যে পুত্র সন্তানটি মারা যায়। এত দুঃখের পরে আসে তাদের এই ছোট্ট মেয়েটি। সকলের চোখের মণি, বুকের বল এবং তার বাবার সবচেয়ে আদরের ছোটো মা। যখন মেয়েটি জন্মগ্রহণ করলো তখন জানিনা কী কারণে মেয়েটির একটা পা বাঁকা ছিলো। কিন্তু তার বাবা-মা কখনোই তাকে অবহেলা করেনি। আর তার বড়ো দিদির মতো করে তাকে ধীরে ধীরে অনেক কষ্ট করে বড়ো করে তুলেছে। তার পা ঠিক করে তুলেছে ভগবানের আশীর্বাদে। এই ছোট্ট মেয়েটির সবচেয়ে আদরের একটা মানুষ আছে তার বড়ো দিদির একমাত্র পুত্র নাম সৌমাল্য মন্ডল। এই মেয়েটির এখন আদরের জায়গা বলতে তার মা ও তার বড়ো দিদি। এতো দুঃখের মাঝেও তাদের চারজনের সংসারে শান্তি সর্বদা অটল থাকতো। এই ছোট্ট মেয়েটির বাবা তাকে ছেড়ে আজ ছয় বছর পরলোকগমন করেছেন। এই ছোট্ট মেয়েটিকে তার বাবা নাম দিয়েছিলেন প্রীতি। যার নামের অর্থ শান্ত, ভদ্র, মিষ্ট-স্বভাবের একটি কন্যা। এই মেয়েটির ছোটো থেকে একটাই আবদার আহ্লাদের জায়গা ছিল তার বাবার কাছে। দিনটি ছিল ২০১২ সালের আগষ্ট মাসের ১১ তারিখ। সকাল থেকেই আকাশে জমেছে ঘন কালো মেঘ। চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন। শ্রাবণ মাসের শেষ শনিবার শনি ঠাকুরের পুজার আয়োজন চলছে চারিদিকে। হঠাৎ বাবা আগেরদিন রাত্রে তার মেয়েকে ডেকে বলছেন আমার মুখে একটু জল দে মা। সেই ছোট্ট মেয়েটি অবস্থা না বুঝেই তার বাবার মুখে জল দেয় এবং সেই রাত্রি বেলায় পাড়া-প্রতিবেশীদের ডাকে যাতে কেউ তার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মেয়েটি সারারাত বুঝে উঠতে পারেনি সে কী করবে ? এই সময় রাতে তার মা একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখাশোনা করতো যাতে তাদের সংসার ভালো ভাবে চলে। পরদিন ভোর হতে না হতেই সেই মেয়েটি ছুটতে ছুটতে তার মা র কাছে যায় এবং খবর দেয় যে আগের দিন রাতে তার বাবাকে পাড়া প্রতিবেশীরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার মা সেখান থেকে এসে মেয়েটিকে বাড়িতে একা রেখে চলে যায় বাবার কাছে। শনি ঠাকুরের পূজো চলছে চারিদিকে সেই মেয়েটি তখনও জানে না

উপোস করলে কি হয় ? তবুও সে উপোস করে থাকে এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যাতে তার বাবা সুস্থ হয়ে ওঠে। তার বাবাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার বাবা সামনের বাড়ির কাকু-কাকিমাকে বলে যায় যে আমার ছোট্ট মেয়েটা ও তার মা-কে তোমরা দেখো। আমি হয়তো আর ফিরে আসবো না। এরই মধ্যে খবর পেয়ে তার দিদি জামাইবাবু সবাই চলে আসে তার বাবার কাছে। তখনও তার বাবার ইচ্ছে ছিল তার বড়ো মেয়ের হাতে ভাত খাবে। দিদি তাই করলো। বাবাকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিল। তারপর তার বাবাকে বারুইপুর হাসপাতাল থেকে বদলি করে দেওয়া হয় কোলকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতালে। সারাটা রাস্তায় গাড়িতে তার বাবা এতটা কষ্ট পেয়েছে তা চোখে দেখা বা সহ্য করা যায় না। তবুও অনেক কষ্ট করে তার বাবাকে নিয়ে যায় কোলকাতায়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর তার বাবাকে অক্সিজেন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেই অবস্থায় তার বাবাকে একবার তিনতলা-দুতলা টানা হেঁচড়া করার পর যখন ICU তে দেওয়া হয় সেখানে কোন বেড নেই। তার বাবাকে মেঝেতে বেডসিট পেতে শোয়ানো হয়। তার বাবা মারা যাওয়ার আগে খুঁজেছিল সেই তার বাবার ছোট্ট আদরের ছোটা মাকে। বিকেল 4.30 নাগাদ তার বাবা মেয়েটির সাথে ফোনে কথা বলে মেয়েটিকে বলে আমি হয়তো আর ফিরব না তুই ভালো থাকিস এবং তোর মাকে তুই দেখিস। এই কথা শুনে মেয়েটি ভেবেছিল তার বাবা তার সাথে মজা করছে কারণ তার প্রায়ই শরীর অসুস্থ হতো, হাসপাতালে যেতো আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসতো। এই ভেবে সে আর বাবার সাথে কথা বলেনি, ভেবেছিল তার বাবা বাড়ি ফিরে আসবে। কিন্তু তার ধারণাটা যে ভুল ছিল সেটা সেই ছোট্ট মেয়েটি বুঝতে পারেনি। তারপর আজ পর্যন্ত সে তার বাবার গলায় ছোটো মা ডাকটা আর শুনতে পায়নি। বিকেল 5.00 নাগাদ তার বাবা সমস্ত মায়া কাটিয়ে চলে যায় অনেক দূরে। রাত 11.00টার সময় তার বাবাকে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। মেয়েটি ভাবছে তার বাবা ঘুমাচ্ছে কিন্তু মেয়েটি যে জানে না তার বাবা তার সাথে আর কথা বলবে না। তার বাবাকে সে আজও খুঁজে পায়নি। কোথায় গেছে তার বাবা, এখন বর্তমানে তার মা-ই তার বাবা। সবই তার মা। এই ছোট্ট মেয়েটির রাগ, অভিমান কষ্ট সামলানোর একটাই মানুষ তার মা। সে মায়ের সাথেই মজা করে, ঝগড়া করে আবার হস্টেল থেকে বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলের কাছে ঘুমায়। এতো ঝড় সামলে একের পর এক বাঁধা অতিক্রম করে মাধ্যমিক পরীক্ষা পেরিয়ে আজ সেই ছোট মেয়েটি উচ্চমাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে নিজের যোগ্যতায় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে যথাসাধ্য পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটির স্বপ্ন ছিল কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনা করে এগিয়ে যাওয়ার কিন্তু সংসারের আর্থিক অবস্থা অনটনের অভাব তাকে আর সুযোগ করে দিলনা। তবুও সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তার মা এর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করে তার মাকে হাসির মুখ দেখাতে। এই ছোট মেয়েটি একান্তভাবে সে তার হস্টেলের গুরুজনদের আশীর্বাদ আশা করে। এবং ঠাকুর, মা, স্বামীজির আশীর্বাদ তার একমাত্র পাথেয়। আপনাদের আশীর্বাদ ও তার চেষ্টায় আশা করা যায় সে তার মা এবং বাবা ও তার নিজের স্বপ্ন পূরণে উত্তীর্ন হবে।

কমনরুম

অস্মীতা মন্ডল

প্রথম বর্ষ (সাম্মানিক) শিক্ষাবিজ্ঞান

কলেজের একটি ছোট্ট ঘর,
নাম তার কমন রুম
সোম থেকে শনি
প্রতিদিন চলে কত হইচই এর ধুম।

কত গল্প, কত মজা আর হাসি-গানে,
মিলেমিশে সব এক হয়ে যায়
এই কমন রুমে।।

ক্লাসের পর যখন আসে
অফপিরিয়ডের পালা
একছুটে মন, চলে যায় তখন,
বসে কত প্রাণের মেলা।

চলতে থাকে হাসি-আড্ডা,
সাথে হোয়াটস্যাপ্-ফেসবুক!
বাদ থাকে না ইউটিউব আর
অলাইনের গ্রুপ।

অবশেষে আসে ছুটির সময়
কমনে পড়ে যায় সাড়া,
মনে পড়ে সবে, বাড়ি যেতে হবে
লাগে সবার তাড়া।

প্রতিদিনের মতো নিস্তব্ধতায়
ঘিরে থাকে তার ক্লান্তি ভরা ঘুম,
আমাদের কাছে স্মৃতি হয়ে থাকে
আমাদের এই কমন রুম।।

রক্ষণশীলতা ও প্রগতিবাদের সমন্বয় — শ্রীমা

ঋতু পোল্লে
দর্শন বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিবাদের সমন্বয় দেখা যায়। সমস্ত কিছুকে রক্ষণাবেক্ষণ যেমন তিনি করতে পারতেন তেমনি প্রগতিবাদের প্রতি তার স্নেহও ছিল। সারদানন্দ মহারাজ লিখেছিলেন — একবার যখন স্বদেশী কিছু লোক মঠে ঠাকুরের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন মা তাদের আশ্রয় দেন। অর্থাৎ এই সমস্ত স্বদেশী লোক সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঠাকুরের নাম গ্রহণ করার জন্য মঠে এসেছেন। কিন্তু ইংরেজরা তখন পত্রিকাতে লেখেন রামকৃষ্ণ মঠ স্বদেশীদের আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করেছেন। এই সমস্ত কথা সারদানন্দজী মহারাজের মাধ্যমে মায়ের কর্ণগোচর হওয়ায় মা মহারাজকে বলেন — "তুমি ইংরেজদের গিয়ে বল ওরা আগে স্বদেশী করলেও এখন তারা ঠাকুরের নামে মঠে এসেছেন। অর্থাৎ এখন আর স্বদেশী করছেন না। তাই তারা যেন মঠের নামে এ সমস্ত কথা প্রচার না করেন।" মায়ের কথায় তারা (ইংরেজরা) তাদের এই বক্তব্য ভুল বলে উল্লেখ করেন। এইভাবে রক্ষণশীলতার মধ্যে ও প্রগতিবাদের মধ্যে সমন্বয় প্রকাশিত হয়। আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মায়ের এইরূপ উভয় মনোভাবের সমন্বয় পরিলিক্ষিত হয়।

শ্রীমা ও ঠাকুর ছিলেন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। শুধুমাত্র ত্যাগ, ভালোবাসা, মমতা, সহানুভূতিশীলতা এবং এক অপার আনন্দ লাভের মধ্যে দিয়ে তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়। এছাড়া ঠাকুর মাকে ষোড়শী পূজার মাধ্যমে দেবীজ্ঞানে উন্নীত করেন, সাধারণ দাম্পত্য জীবনে যা সচরাচর দেখা যায় না। ঠাকুর ও মায়ের দাম্পত্য জীবন ছিল এক অপার আনন্দের আধার। এ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই মা হৃদয়ে আনন্দ লাভ করতেন।

মানবজীবনের গৌরব ও অর্জনের উপায়

ঋতু পোল্লে
দর্শন বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

সকল জন্মের থেকে মনুষ্য জন্মকেই শ্রেষ্ঠ জন্ম বলা হয়। কারণ পশু জগৎ ও প্রাণী জগতের থেকে মনুষ্য জগৎ সর্বোন্নত। মানুষ হল এমন প্রাণী যারা বিচার বুদ্ধির অধিকারী। কোনো একটি বিষয়ে বিচার করার বুদ্ধি মানুষের মধ্যে থাকে। যেটা অন্য কোনো প্রাণী (পশু, পাখী ইত্যাদি) এদের মধ্যে থাকে না। তাই এদিক থেকেও মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে।

অপর দিকে মানুষের মধ্যে রয়েছে মমত্ববোধ, একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, কারও দুঃখে তার পাশে দাঁড়ানোর প্রবণতা। কিছু কিছু প্রাণীর মধ্যেও ভালোবাসা দেখা দিলেও তারা সম্পূর্ণ মমত্বপূর্ণ হয় না বা একে অপরকে সাহায্য করার যে বোধ তা তাদের মধ্যে আসে না। এদিক থেকেও মনুষ্য জন্মকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

সবশেষে বলা যায় আমাদের ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নত। একমাত্র মানুষই পারে ধর্মসাধনা করতে। অন্য কোনো পশু বা প্রাণী ধর্মসাধনা করতে পারে না। মানুষই একমাত্র তার অধিকারী। তাই মনুষ্যজন্মকেই শ্রেষ্ঠ জন্ম বলে উল্লেখ করা হয়।

আমার মতে জীবনের গৌরব রক্ষা ও সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য টাকা-পয়সা এবং ধন-সম্পত্তির প্রয়োজন হয় না। সৎ পথে চলা, সৎ কথা বলা এবং সৎ সঙ্গে মেশাই মানুষের গৌরব রক্ষা করে। যদি কোনো মানুষের বহু সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বিপদে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ না থাকে তাহলে তার গর্ব করা উচিত নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সে দুঃখী। অপরদিকে যার ধনসম্পত্তি না থাকলেও বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর মতো বহু মানুষ থাকে সেই-ই প্রকৃত সুখী।

তাছাড়া যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই নিজেকে গর্বিত মনে করবেন। তাই আমার মনে হয় একজন প্রকৃত, সৎ মানুষ হওয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের গৌরব রক্ষিত ও সমৃদ্ধ হয়। প্রকৃত মানুষ বলতে নিঃস্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির কথাই উল্লিখিত। শুধু সব কিছু নেওয়ার মধ্যে সুখ থাকে না, নিজেকে নিঃস্ব করে অপরকে দেওয়ার মধ্যে অধিকতর সুখ বিদ্যমান।

আমার জন্মভূমি

ঋতু পোল্লে
দর্শন বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

"সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি" — উদ্ধৃতাংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত। ভারতবর্ষ সুজলা, সুফলা এবং শস্যশ্যামলা। বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের এই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত। ভারতবর্ষের প্রকৃতি, পরিবেশ অপরূপ সুন্দর। ধনরত্ন, পুষ্পখচিত এই দেশ। শুধু তাই নয় এই দেশে রয়েছে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। আর কোনো দেশেই এত স্নেহ ভক্তি দেখা যায় না। তাই বলা হয়েছে সকল দেশের রানী হলেন আমাদের ভারতবর্ষ তথা ভারতমাতা। তিনি যেন মমতাময়ী, স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ তাঁর হৃদয়। তাঁর মতো সহ্যশক্তিও কারও নেই। তাঁর ওপর দিয়ে কত অত্যাচার চলছে কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুই নীরবে সহ্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি সহ্যশীলা।

কবি এ সকলের পাশাপাশি ভারতবর্ষের অপরূপ সৌন্দর্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবাই যেন এক শৃঙ্খলায় এক নিয়মে জাগ্রত হয়। আর পাখীরা কুঞ্জে কুঞ্জে গান গেয়ে বেড়ায় এবং দিনের শেষে তারা সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। এত সুন্দর এই প্রকৃতি। মা যেমন তার সন্তানকে রক্ষা করে চলেন, ভারতমাতাও ঠিক তেমনি তাঁর কোলে উপবিষ্ট অর্থাৎ এই দেশে বসবাস করেন যারা তাদের সন্তানের মতো রক্ষা করে চলেছেন। পৃথিবীর আর কোনো দেশেই আমরা তা দেখতে পাই না। তাই এখানে বলা হয়েছে — "সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি" — অর্থাৎ সমস্ত দেশের মধ্যে মাতৃস্থানীয়া হলেন আমার এই ভারতবর্ষ।